অপচয় ও উন্নতি।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র-প্রণীত।

উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ ;
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

হিতোপদেশ।

"Gather up the fragments that remain, that nothing be lost."

St. John VI. 12.

Calcutta.

Published by Jogesh Chandra Banerjee,
Canning Library.
PRINTED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
63-3, *Machooa Bazar Road.*
1890.

OPINIONS OF THE PRESS.

"Baboo Bishnoo Chandra Moitra has written an able and thoughtful book in Bengali which he calls Apachai O Unnati. This rendered in English means "Waste and improvement." The writer, in a lucid and forcible style, discusses various problems connected with his subject, both mental and physical. In support of positions taken up by him, he introduces happy illustrations that serve to relieve the sombre gravity of general treatment of the work. Its perusal will, we are persuaded, be most beneficial to the young, whose character has yet to be formed. It can be fitly introduced as a text-book in our Schools. *The Hindu Patriot.*

"An Useful Publication.—Waste and progress (*Apachai O Unnati*) by Baboo Bishnu Chundra Moitra, Vakil, Allahabad, and published by Jogesh Chundra Banerjee, Canning Library, Calcutta. We regret we could not review this Bengali work earlier. It deserves a longer notice than we can here make room for. The style is easy and at the same time elegant. It is very interesting at places from the original thoughts that are contained in it. The author has dwelt with success, as to how the application of our faculties, the husbanding of our resources economically can produce wonderful results. The thoughts are simple and expressed in an unaffected style which is within easy grasp of every one. The work seems to be the production of long labour and thoughtful study. Within a small compass the author has creditably dwelt upon the elementary rules of political economy, physiology and mental philosophy with apt and interesting illustrations. The work is intended to remove a long felt want and its

introduction in our Vernacular Schools is very desirable."— *Amrita Bazar Pattrika.*

"Apachaya-o-Unnati.—It is one of those books which are written for the young, and addressed to those in whose hands their education is placed. It is advisedly so written—for how are the young to find out where to nibble? The author offers them a fine pasture, promises to take them over different grounds, and but for his modesty would claim a newness and freshness for what has been too much trampled upon and browsed over, so that the young mind will only find in it, what the author intends, a foretaste of subjects whose careful study must be postponed till the callow brood have ceased to be callow, and have put on one or two academical feathers. There is a little of every thing in it from Carpenter's "Physiology" and Spencer's "Biology" to Biography and Political Economy. The body, as also the mind, is subject to wear and tear —this is the text to which the author constantly reverts, carefully showing that your gain is the enemy's loss, and your loss the enemy's gain. If we never forgot these kindred little things, if we ever kept awake in our minds a few of the many homely truths, contained in this book, we would be better equipped for the struggle for existence that hems us all round. But human shortsightedness is proverbial. We can only hope that young people, for whom this book is meant, will never grow so short-sighted, as not to see what lies so very much within their reach."— *The Indian Mirror.*

"Apachaya-o-Unnati :—This little book deserves the attention of the public by its practical as well as philosophical suggestions made on an all important subject, namely, how to arrest the deterioration going on in every individual, and to ensure the progress that depends on the better use of physical, mental and economical habits. It is needless to say that the author has treated his subject with sufficient ability and good

taste. A glance at the book will convince even a care-less reader that he has taken up a book which will prof[it] him by good many practical suggestions. We ma[y] safely recommend this book to the perusal of the publi[c] and make bold to say that it is an addition to th[e] Vernacular literature which is growing in importanc[e] every day.

Unity and the Minister

"অপচয় ও উন্নতি।... ... ...গ্রন্থখানি বিষ্ণুবাবুর প্রগাঢ় চিন্তা প্রসূত।... ...ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া যাঁহাদের মন ইংরাজি ভাবের দিকে প্রবণ, তাঁহাদের এ গ্রন্থ বিশেষ ভাল লাগিবে। স্থান বিশেষে আমাদের সহিত মতের মিল না থাকিলেও, গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পরিশ্রম, স্বন পরীক্ষা, মনঃসংযোগ, স্মরণশক্তি, আসক্তি, আত্ম-নির্ভর, কল্পনাশক্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য... ...ইত্যাদি বিষয় সকল অতি সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে যৌথ কারবার এবং বাণিজ্যাদির কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত।"

বঙ্গবাসী।

"অপচয় ও উন্নতি।... ...শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক এই ত্রিবিধ অপচয় ও উপচয়ের কথাই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক শক্তির অপচয়ই অসুখের মূল এবং উপচয় বা উন্নতিই সুখের কারণ, গ্রন্থকার ইহা বিশদরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গ্রন্থকারকে অনেক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া, অনেক অধ্যয়নে জ্ঞানার্জন করিয়া, অনেক চিন্তায় চিন্তাশীলতা অভ্যাস করিয়া তবে এই গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সর্বজনপাঠ্য; [illegible] যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই আলোচ্য এবং শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে। বঙ্গ

সাহিত্য বাজারে ঝুটা রেজাটে বস্তাপচা মালই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ রত্নের বড়ই অভাব। মৈত্র মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।.... ....অপচয় ও উন্নতি যে অনেকেরই উন্নতি সাধন করিবে তাহা স্থির। গ্রন্থের সর্ব্বত্র আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব।" দৈনিক।

"গ্রন্থের "অপচয় ও উন্নতি" নাম দেখিয়াই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ইহাতে কেবল অর্থনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা থাকিবে, কিন্তু ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া জানিলাম, কেবল পাশ্চাত্য অর্থনীতি নহে, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।... ...গ্রন্থকার নানাবিধ অপচয়ের কার্য্য কারণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সমাজের ও বাঙ্গালি জাতির বর্ত্তমান অবনতির কথা যেরূপ দক্ষতার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ আবার উন্নতির কার্য্য কারণ নির্দ্দেশ কালেও ঐ সমাজের সামাজিক গণের অবলম্বনীয় উপায়ের কথাও বিশদরূপে ও যুক্তি সহকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার বিষয় বিশেষে মহৎ মহৎ লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উদাহরণ স্বরূপ আহরণ করিয়াছেন। বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার যে প্রার্থনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সঞ্জীবনী।

"যে কয়েকখানি গ্রন্থে আমরা 'থাড়া বড়ি থোড়ের' এক ঘেঁয়ে যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি, বিধুবাবুর পুস্তক খানিও তন্মধ্যে গণ্য। ইহাতে অনেক গুলি বৈজ্ঞানিক সরল উপদেশ সরল কথায় প্রকটিত হইয়াছে। আমরা ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহা বালক দিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ

উপযোগী। অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক যুবক দিগের পক্ষেও জ্ঞানপ্রদ বটে। এ প্রকার গ্রন্থের সমালোচনায় প্রধানতঃ তিনটী বিষয় দেখা উচিত—ভাষা, চিন্তা ও উদ্দেশ্য। বিষ্ণুবাবুর রচনা নৈপুণ্য আছে; চিন্তারও তিব্র রেখা প্রতিফলিত হইয়াছে; উদ্দেশ্যও মহৎ; সুতরাং ইহা স্থূলতঃ সর্ব্ব প্রকারে আদরণীয়।" হিতবাদী।

"অপচয় ও উন্নতি।—এই গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র প্রণীত, নববিভাকর প্রেসে মুদ্রিত। আমরা ইহা পাঠ করিয়া একান্ত সুখী হইয়াছি। অনেক গ্রন্থ এখন প্রণীত ও মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ অসার বিষয়ে পূর্ণ, এখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সারগর্ভ। শরীর মন ও অর্থের অপচয় নিবারণ করিয়া কি প্রকারে উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, ইহাই প্রদর্শন করা গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঈদৃশ উদ্দেশ্য বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কতদূর সুকঠিন কার্য্য ইহা সকলেই বুঝিতে পারেনা। এই লক্ষ্য সাধন সামান্য অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনে হইতে পারে না, গ্রন্থকর্ত্তা প্রতিজ্ঞাত বিষয়টী প্রতিপাদন করিতে যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একখানি ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের ভিতরে যতদূর প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সমাবেশ সম্ভব, আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকার তাহা করিয়াছেন। যাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, আমরা আশা করি, তাঁহারা বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব।

"অপচয় ও উন্নতি।··· ···ইহাতে মানসিক শারীরিক ও সাংসারিক সকল প্রকার অপচয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত ও তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তক

প্রণয়নে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ পুস্তক সমাজের বিশেষ কল্যাণকর।" বামাবোধিনী পত্রিকা।

"অপচয় ও উন্নতি।—মানব কি উপায়ে শারীরিক মানসিক ও আর্থিক অপচয় নিবারণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এই পুস্তকে তাহারই উপদেশ প্রদত্ত। উপদেশগুলি যাঁহারা পালনে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা অচিরে উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা পালন করিতে নাও পারিবেন, তাঁহাদিগেরও বইখানি পড়িতে ক্ষতি নাই। উপদেশস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে সকল বড়লোকদের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পড়িয়া তাঁহারা প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন।" ভারতী।

"অপচয় ও উন্নতি।.... ....কি উপায়ে শারীরিক মানসিক এবং বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি সদুপায় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিলে বুদ্ধি বিকসিত, কর্ম্মক্ষম এবং স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বিষয় কার্য্যে কিরূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণু বাবু এ দেশের এবং বিদেশের প্রতিভাশালী অনেক বড় বড় লোকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠিকাগণ ইহাতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ভাষা অতি সরল এবং বিশুদ্ধ।" পরিচারিকা।

"অপচয় ও উন্নতি। এই পুস্তকে মানুষের কর্ত্তব্য, মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক অপচয় ও উন্নতির বিষয় কয়েকটী অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ, লেখাও ভাল। এই গ্রন্থ উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা স্কুলে অধীত হইবার যোগ্য।" নব্যভারত।

উৎসর্গ।
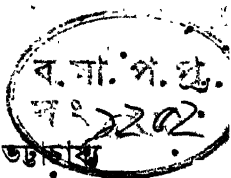
পরমারাধ্য ৺রাজনারায়ণ (মৈত্র) ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের পূত পদে।

পিতৃদেব!

প্রায় ৩৯ বর্ষ অতীত হইল, যখন আমি জননীর ক্রোড়ে, আপনি সংসারের মায়াময় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আপনার লেখনী আর "সংবাদ রত্নাবলী" ও "সমাচার চন্দ্রিকার" কলেবর দীপ্তিমান করে না,—আপনার "পঞ্জাবেতিহাস" বিলুপ্তপ্রায়। যে "ভূম্যধিকারী সভার" কার্য্যে আপনি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাও অদর্শন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সভা যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণে নানা রাজনৈতিক বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে—গভীর সামাজিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত।

আপনার যত্ন আমার মনের যে বিকাশ সাধন করিতে পারিত, তাহা হয় নাই,—আপনার প্রেমমূর্ত্তি আমার স্মরণের অতীত। কিন্তু আপনার পবিত্র মনঃ-জ্যোতি আমার মনে ভাতিত হইতেছে। সেই জন্যই, সময় ও অবস্থার মহান্ পরিবর্ত্তনেও, আপনার প্রদর্শিত পথে বিচরণ-বাসনা আমার হৃদয়ে সদা জাগরিত। কিন্তু দেব! আজ অনাথ অসহায়, সেই পথে প্রবেশ-উদ্যম করিতেছি। মনের দৃঢ় ধারণা, আপনার আশীর্ব্বাদ আমাকে এই নূতন কিন্তু চির ঈপ্সিত পথে চালিত করিবে। এই প্রথম উদ্যমের ফল আপনার পূত পদে অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

যে উদ্দেশে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। যিনি ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তিনি অনায়াসেই ইহার উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। কিরূপে অপচয় সংঘটিত হয়, কিরূপে তাহা নিবারণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে সংসারে প্রত্যেক মনুষ্যকে কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়; যথোচিতরূপে সেই সকল কর্ত্তব্য পালনের উপর আমাদের উন্নতি ও সুখ নির্ভর করে; কর্ত্তব্য পালন পরিশ্রম সাপেক্ষ; পরিশ্রম দ্বিবিধ,—শারীরিক ও মানসিক; কর্ত্তব্য পালন উদ্দেশে শারীরিক ও মানসিক অপচয় নিবারণ নিতান্ত আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অপচয় বশতঃই আমরা যথোচিতরূপে কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হই না,—সর্ব্ব-প্রকার অবনতির মূলে অপচয়,—অপচয় নিবারণ ব্যতীত উন্নতি ও মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব। অপচয় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে:—মানসিক অপচয়, শারীরিক অপচয় ও আর্থিক অপচয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে মানসিক অপচয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। কিরূপে মানসিক অপচয় সংঘটিত হয়,

কিরূপে তাহা নিবারিত হইতে পারে, কিরূপে মানসিক শক্তি পরিবর্দ্ধিত ও পরিচালিত করিয়া উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশীয় ও ইউরোপীয় মহৎব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় দু একটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে শারীরিক অপচয়ের আলোচনা করা হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রধান নিয়ম বিবৃত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে শারীরিক পরিশ্রম বিবেচিত হইয়াছে। যে সকল নিয়মে শারীরিক পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ী হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ে আর্থিক অপচয়ের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। কিরূপে অর্থ উৎপাদিত, কিরূপে সঞ্চিত এবং কিরূপে তাহা উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমি এই পুস্তকে কোন জীবিত ব্যক্তির চরিতাখ্যায়িকা সন্নিবেশিত করি নাই, কেবল শারীরিক পরিশ্রম সম্বন্ধে মহামান্য গ্লাডষ্টোন সাহেবের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা বলা বাহুল্য, (বিলাতের ত কথাই নাই), এদেশীয় জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও আদর্শ চরিত্রের নিতান্ত অপ্রতুল নাই। কিন্তু সেই সকল মহোদয়ের অনুমতি বিনা তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, শারীরিক

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব রচনা কালে কারপেণ্টার, মিলার ও কার্ক প্রণীত শরীর-বিজ্ঞান (Physiology) পুস্তক হইতে এবং অষ্টম ও নবম অধ্যায় রচনা কালে স্মিথ প্রণীত "ওয়েলথ্ আব্ নেসন্স (Wealth of Nations) এবং মিল, ফসেট; ও মেম ফসেট প্রণীত অর্থনীতি (Political Economy) গ্রন্থ হইতে সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে হারবার্ট স্পেন্সর প্রণীত "এডুকেশন" (Education) 'ষ্টডি আব্ সোসিয়ালজি' (Study of Sociology) এবং "বিয়লজি" (Biology) নামক গ্রন্থ হইতে সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি।

ইউরোপীয়গণের জীবনী নানা স্থান হইতে, প্রধানতঃ বিয়োগ্রাফিকেল ডিক্সনরি (Biographical Dictionary) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলী প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে ও কিয়ৎপরিমাণে মোক্ষমূলর প্রণীত "বিয়োগ্রাফিকেল এসেজ্" (Biographical Essays) নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী মোক্ষমূলর প্রণীত "বিয়োগ্রাফিকেল এসেজ্" (Biographical Essays) এবং সংবাদ পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পালের জীবনী সংবাদ পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত চরিতাখ্যায়িকা সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, নানা অনিবার্য্য কারণে, বিশেষতঃ সময়ের অল্পতা নিবন্ধন, এই পুস্তক খানি ইচ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশে অক্ষম হইলাম। সহৃদয় পাঠক ভ্রম প্রমাদ জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি যথা সাধ্য যত্নের ত্রুটি করি নাই। যদি ইহা পাঠে কাহার কিছু মাত্র উপকার হয় তবে সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

মাজিদা, বর্দ্ধমান।
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০। } শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মানসিক অপচয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

মানসিক অপচয় (অবশিষ্টাংশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানসিক অপচয়—মনের স্বাস্থ্য।

সপ্তম অধ্যায়।

শারীরিক অপচয়—স্বাস্থ্যবিধান।

অষ্টম অধ্যায়।

শারীরিক অপচয়—পরিশ্রম।

নবম অধ্যায়।

আর্থিক অপচয়।

অপচয় ও উন্নতি।

প্রথম অধ্যায়।

কর্ত্তব্য পালন।

সংসারে প্রত্যেক মনুষ্যকে কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যে কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত এবং আমাদের মঙ্গল ও উন্নতির উপযোগী, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, কোন্‌টী মুখ্য কর্ত্তব্য, কোন্‌টী গৌণ কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কারণ ন্যায়জ্ঞান সকল মনুষ্যে সমভাবে বিকাশিত নহে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে, তাহার জ্ঞান ও অবস্থা বিবেচনায়, কিয়ৎপরিমাণে কর্ত্তব্যের প্রভেদ আছে। রাজার পক্ষে যাহা মুখ্য কর্ত্তব্য, প্রজার পক্ষে তাহা না হইতে পারে; জ্ঞানীর সম্বন্ধে যাহা প্রধান কর্ত্তব্য, মূর্খের সম্বন্ধে তাহা গৌণ কর্ত্তব্য হওয়া অসম্ভব নহে।

এই গুরুতর বিষয় ধর্ম্ম-নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য; তাহার আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সাধারণতঃ আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহ যে কয়েকটী প্রধান ভাগে বিভক্ত তাহার উল্লেখমাত্র করা এখানে প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, আত্মরক্ষা ও নিজ মনের উৎকর্ষসাধন; দ্বিতীয়তঃ, পরিবার পালন ও সন্তানগণের শিক্ষা বিধান; তৃতীয়তঃ, স্বদেশীয় সমাজের হিতসাধন; চতুর্থতঃ, সাধারণ মানব সমাজের হিতসাধন।

আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্যকে রক্ষা করা বা কোন প্রকার কর্ত্তব্য পালন করা অসম্ভব। নিজ মনের উৎকর্ষ সাধনের উপর সর্ব্ব প্রকার উন্নতি ও যথোচিতরূপে অপরাপর কর্ত্তব্য পালন নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পরিবার পালন করায় সমাজ রক্ষিত হয়, নিজ সন্তানকে শিক্ষাদান করায় সামাজিক অজ্ঞানতা দূর হয়। প্রত্যেক সমাজের মঙ্গলে সাধারণ মানব সমাজের মঙ্গল। যেমন আত্মরক্ষা ও আত্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পালন ও তাহার মঙ্গল সাধন প্রয়োজন এবং তদ্দ্বারা নিজ রক্ষা ও শিক্ষার সহায়তা হয়, সেইরূপ পরিবারের রক্ষা ও মঙ্গল সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ রক্ষা ও তাহার

মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারাও পরিবার রক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির সহায়তা হয়।

দেহ যেমন একটী যন্ত্র, সমাজও সেইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ-যন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ। সমাজ অভ্যন্তরে প্রত্যেক মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটনা—প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল বা মন্দ কার্য্য—সমাজ-যন্ত্রকে ভাল বা মন্দ ভাবে স্পর্শ করিবে এবং তদনুযায়ী ফল প্রসব করিবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহা তোমাকেও ভুঞ্জিতে হইবে।

যেমন কোন স্থান দুর্গন্ধময় হইলে সে স্থানবাসী সমস্ত লোককেই দুর্গন্ধ যাতনা ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ সমাজ অভ্যন্তরস্থ পূতিগন্ধ অপরাপরের সহিত তোমার শোণিতও দূষিত করিবে সন্দেহ নাই। যেমন দেহের এক অঙ্গে পীড়া হইলে অপর অঙ্গেও কিয়ৎ পরিমাণে সাহানুভূতিক যাতনা অনুভূত হয়, সেইরূপ সমাজ-যন্ত্রের যে কোন অংশে রোগ উৎপন্ন হউক, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে তোমাকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে। যদি সমাজ মধ্যে বিপ্লব বা মহামারী উপস্থিত হয়, তবে তুমি কি নিরাপদ থাকিতে পার? তোমার প্রতিবেশী ঘোরতর অপব্যয়ী সুরাসক্ত দুর্নীত ব্যক্তি। মনে করিও না তুমি নিরাপদ। তাহার দুশ্চরিত্রবশতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

নানাবিধ অপকার হইতেছে ও হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অলক্ষিতে কত অমঙ্গল হইতেছে? হয়ত তাহার অসদ্দৃষ্টান্তে তোমার সন্তানগণের সর্ব্ব-নাশ হইতেছে, তাহার ন্যায় আর ২।৪টী লোক অধঃপতিত হইতেছে। সেই ব্যক্তি হতসর্ব্বস্ব হইয়া জীবন শেষ করিল। তাহার পরিবারবর্গের দিন-পাতের উপায় নাই। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, কিয়ৎ পরিমাণে তোমাকে তাহাদের অভাবমোচন করিতে হইবেই হইবে। হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত মূর্খের সহবাস-যাতনা কে না অনুভব করিয়াছেন?

সমাজ মঙ্গলেও সেইরূপ তোমার মঙ্গল। যদি সমাজমধ্যে সুচারু শাসন ও শান্তি স্থাপিত হয়—জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধিত হয়—অর্থের ব্যাপ্তি হয়—তবে অপরাপর লোকের সহিত তুমিও তাহার ফল-ভোগী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং সমাজের হিতসাধন চেষ্টা কেবল সৎকার্য্য নহে—শ্লাঘার বিষয় নহে—তোমার পক্ষে তাহা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মনের উন্নতির উপর যথোচিতরূপে কর্ত্তব্য পালন নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার,—মন কি পদার্থ? ইহার উত্তর সহজ নহে। ইহা মনোবিজ্ঞান

শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। মনের আকার নাই, সুতরাং তাহা দৃষ্টিগোচর নহে এবং জড় নহে। কিন্তু সেই অদৃশ্য পদার্থ দেহ যন্ত্রের নেতা। আমরা যাহা কিছু করি সকলই মনের আদেশ অনুসারে। যদিও দেখিতে না পাই, আমরা মনের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারি এবং এই উপায়ে আমরা মনের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া থাকি। মনের আকার নাই, মন জড় নহে, কিন্তু বুদ্ধি, বাসনা, নিজ অস্তিত্ব ও সুখ দুঃখানুভব, ইত্যাদি মনের গুণ বা শক্তি; সুতরাং মনকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টি বলা যাইতে পারে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সেই সকল শক্তি অস্ফুট থাকে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে বিকাশমান হয় এবং ক্রমে নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

মন জড় ব্যতীত ক্রিয়াবান হইতে পারে না। মনের সহিত মস্তিষ্কের অতি গূঢ় সম্বন্ধ। মনের সমস্ত ক্রিয়া মস্তিষ্কের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্কের সহিত স্নায়ু মণ্ডলের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্নায়ু মণ্ডলের সহিত পেশীর সংযোগ আছে। এই সকল সহায়ে মনের সহিত বাহ্য জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। স্নায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া অনেক পরিমাণে বৈদ্যুতিক তারের ন্যায়। তাহা

ক্রমাগত শরীরের এক স্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ লইয়া যাইতেছে। ফল ফুলে সুশোভিত একটী বৃক্ষ ঐ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। চক্ষের উপর সেই চিত্র পতিত হইল। স্নায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া দ্বারা তাহা মস্তিষ্কে পৌঁছিল, তোমার মন সম্মুখস্থ বৃক্ষের অস্তিত্ব অনুভব করিল। তোমার মনে হইল ঐ বৃক্ষের একটী কুসুম চয়ন করিবে। অচিরাৎ মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান হইল এবং স্নায়ুগণকে উত্তেজিত করিল, স্নায়ুগণ হস্তের পেশীগণকে উত্তেজিত করিল, হস্ত প্রসারিত হইল, দৈহিক বল প্রয়োগে কুসুম চয়ন করিলে। এক ব্যক্তি গীত গাইতেছে। সঙ্গীত-ধ্বনি সম্মুখস্থ বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল,—তথাকার স্নায়ুগণকে আঘাত করিল,—অমনি তাহারা উত্তেজিত হইল,—মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছিল,—তুমি সঙ্গীত অনুভব করিলে।

এইরূপে অদৃশ্য ও শক্তিময় মন, দৃশ্যমান জড়ময় মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও পেশীর সহায়তায়, বাহ্যিক পদার্থ সমূহের উপর ক্রিয়াবান হয়; এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ও মনের বিকাশ হইতে থাকে। জ্ঞান দ্বারাই মনের উৎকর্ষ ও মনোবৃত্তি নিচয়ের সামঞ্জস্য সাধিত হয়, যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হয় ততই মন উন্নত হয়। যাহা কিছু সত্য তাহাই জ্ঞাতব্য। পরমেশ্বর সমস্ত

জ্ঞান, সমস্ত সত্যের আধার। ব্রহ্মাণ্ড অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার স্বরূপ। আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সজীব ও নির্জ্জীব জগৎ—সকলই জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মজ্ঞান দীপ্তিমান না হইলে মনের প্রকৃত উন্নতি বা উৎকর্ষ অসম্ভব। আমরা সেই জ্ঞান বলেই সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। যেমন সাগরের জল বাষ্পরূপে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মেঘে পরিণত হয়—মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে—সেই বারি আপনার নিয়তি সাধন করিয়া পুনরায় সাগরে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ যখন পরমেশ্বর-রচিত মানব-মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে সুশোভিত হইয়া—সংসারের উন্নতি সাধন করিয়া—সেই অনন্ত জ্ঞান সাগরে প্রবাহিত হয়, তখনই মানব মনের নিয়তি পূর্ণ হয়।

উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি নিজ নিজ জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী সকলেরই পালনীয়। অবস্থা ভেদে, তাহার একটী বা দুইটী বা সমস্তগুলি পালনের উপযোগী ক্রিয়াতেই মানব জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু নিজজ্ঞান ও অবস্থানুযায়ী সে সমস্ত গুলিই সামঞ্জস্য ভাবে প্রতিপালন করা প্রয়োজন। আমরা যে পরিমাণে কর্ত্তব্য পালন করিব, সেই পরিমাণে সুখী

ও উন্নত হইব। সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করা মন ও শরীরের কার্য্য, অর্থাৎ কেবল মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অভাব ও পরিশ্রম।

বহির্জ্জগতের সহিত মানব মন ও শরীরের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ! মন অদৃশ্য শক্তিময়—বহির্জ্জগৎ দৃশ্যমান জড়ময়। কিন্তু মনের বিকাশ বহির্জ্জগৎ ব্যতীত অসম্ভব। যদি আজীবন বাহিরের কিছুই দেখিতে না পাও, যদি পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, আলোক, অন্ধকার, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি কিছুই দেখিতে না পাও, তবে মনের শক্তি সকল কিরূপে বিকাশমান হইতে পারে? মনের সংস্কার—স্থান, সময় ইত্যাদি নানা বিষয়ক সংস্কার—কিরূপে উদ্রিক্ত হইতে পারে? আবার দেখ, জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, মানব মনের, মানব শরীরের যত কিছু প্রক্রিয়া, সকলই বহির্জ্জগৎ

লইয়া। জল, বায়ু, অগ্নি, রশ্মি, ভুমি, ফল, মূল ইত্যাদি সকলই বহির্জ্জগতে।

চক্ষু আমাদের পক্ষে কি, মহা-প্রয়োজনীয় বস্তু! চারিদিক অন্ধকারময় হইলে কি দেখিতাম? যেমন বিশ্বনিয়ন্তা আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন, সেইরূপ বহির্জ্জগৎ তাহার উপযোগী আলোক ও নানা দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন আলোকে চক্ষু ব্যথিত ও দুর্ব্বল হয়,—দিবার পর রজনীর অন্ধকার!—পৃথিবীর চারিদিক নয়ন তৃপ্তিকর সজীব হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত! জীবন ধারণ জন্য জল বায়ু অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক,—এই অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থদ্বয় পরমেশ্বর জীবগণের অনায়াস-লব্ধ করিয়াছেন। আহার ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না,—পৃথিবী নানাবিধ ফল শস্যে পরিপূর্ণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জননী-হৃদয়ে তাহার আহার্য্য প্রস্তুত। যদি জননী-হৃদয় স্নেহপূর্ণ না হইত তবে কিরূপে অসহায় শিশু রক্ষিত হইত? আমরা শোভা দেখিয়া আনন্দিত হই,—পৃথিবীর চারিদিক অপূর্ব্ব শোভায় পরিপূর্ণ। আমাদের মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিহিত হইয়াছে,—বাহ্যজগতে আমরা পরমেশ্বরের অসীম শক্তি, অপার দয়া ও কৌশল দেখিয়া তাহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই। আমরা সুখের জন্য সদা লালা-

য়িত,—জগৎ সুখভোগ উপাদানে পরিপূর্ণ। জ্ঞান বলে, চেষ্টা বলে, যথোচিত রূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই প্রচুর সুখ ভোগ করিতে পার।

এই সকল দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় যে আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি—তাঁহার গঠিত মানব মন তাঁহার রচিত জগৎ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারে—ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত।

যদি ভোগ উপাদানে জগৎ পরিপূর্ণ—যদি আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করি ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত—তবে সংসারের চতুর্দ্দিকে যাতনার আর্ত্তনাদ কেন? দুঃখ-পীড়িত ক্লেশ-ব্যথিত ব্যক্তিগণের কাতর রবে কি জন্য সমাজ প্রতিধ্বনিত হইতেছে? মানবের যাতনার হেতু অনেক আছে, তাহার সম্যক পর্য্যালোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ অসম্ভব। মানব জীবন সুখ দুঃখ জড়িত। আমরা যে সকল মানসিক ও শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা সুখ অনুভব করিয়া থাকি, সেই প্রক্রিয়া দ্বারা দুঃখও অনুভূত হয়। যে উপায়ে আমরা মধুর সঙ্গীত, মনোহর গন্ধ বা সুখদ আস্বাদ অনুভব করি, সেই উপায়েই শোকজনিত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, পূতিগন্ধ বা তিক্ত

আস্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে সুখানুভব হইতেছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহাতেই দুখাঃনুভূত হইতে পারে। এক্ষণে যাহাদের স্নেহময় মুখ দেখিয়া অতুল আনন্দলাভ করিতেছ, তাহাদের পীড়িত বা মৃত দেহ গভীর শোক উদ্দীপন করিতে পারে। যে কুসুমে সৌগন্ধ, গলিত অবস্থায় তাহাতেই দুর্গন্ধ। আবার, যদি এই পরস্পর বিষম ভাবযুক্ত সুখ দুঃখের একত্র সমাবেশ না হইত—যদি তাহাদের মধ্যে একটীর অস্তিত্ব না থাকিত—তবে আমরা সুখ বা দুঃখের ভাব অনুভব করিতে পারিতাম না। সুখের সহিত দুঃখভাব এবং দুঃখের সহিত সুখভাব জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং সুখ এবং দুঃখ উভয়ই আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। যখন আমরা সুখ বা দুঃখের কথা বলি, তখন তাহার আতিশয্য জ্ঞাপন করাই আমাদের অভিপ্রেত। যখন আমরা বলি যে অমুক ব্যক্তি পরম সুখী, তখন ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে যে তাঁহার কোন দুঃখ নাই,—ইহাই আমাদের অভিপ্রেত যে দুঃখ অপেক্ষা তাঁহার সুখের ভাগ অধিক। যখন আমরা বলি যে অমুক ব্যক্তি দুঃখী, তখনও আমাদের অভিপ্রায় এই যে সুখ অপেক্ষা তাঁহার দুঃখের ভাগ অধিক।

আমরা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের অধীন।

তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত। সে সকল নিয়ম অমোঘ —অটল—ব্যভিচার হীন,—কিছুতেই তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। তাহা ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী। সেই সকল নিয়ম পালন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এবং সেই সকল নিয়ম পালনের উপর আমাদের অন্য সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য পালন নির্ভর করিতেছে। তুমি আত্ম রক্ষা ও নিজ মনের উৎকর্ষ সাধন করিবে? শারীরিক ও মানসিক নিয়ম পালন ব্যতীত তাহা অসম্ভব। তুমি অপরাপরের রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিবে? তাহাদিগকে যথাবিধানে শারীরিক ও মানসিক নিয়ম পালনে নিরত করিতে না পারিলে তাহা অসম্ভব। কর্ত্তব্য পালনে আমাদের মঙ্গল ও সুখ—তাহা লঙ্ঘনে অমঙ্গল ও দুঃখ।

আমরা চারিদিকে যে সকল ক্লেশ যাতনা দেখিতে পাই, বহুল পরিমাণে অভাব তাহার মূলে লক্ষিত হয়। জ্ঞান অভাবে কত যাতনা—স্বাস্থ্য অভাবে কত যাতনা—অন্ন, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি অভাবে কত যাতনা! কিন্তু অভাব গভীর যাতনাদায়ক হইলেও তাহা পূরণের উপায়ও অনেক পরিমাণে আমাদের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। অভাব ক্লেশপ্রদ বলিয়াই আমরা তাহা পূরণের চেষ্টা করি।

আমরা কিজন্য অভাবপীড়িত হই? ইহা সহজ

প্রশ্ন নহে। সাধারণতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, আমরা যে সকল স্বাভাবিক নিয়মের অধীন, যথোচিতরূপে সেই সকল নিয়মানুসারে কার্য্য না করাতে —কর্ত্তব্যপালন না করাতে—অভাব উপস্থিত হয়। আমাদের আবাস-ভূমি পৃথিবী বিস্তীর্ণা হইলেও তাহাতে কোটী কোটী লোক বাস করে। সুখস্বচ্ছন্দে জীবনধারণ জন্য—কর্ত্তব্য পালন জন্য—যাহা তোমার প্রয়োজন তাহা অন্য লোকেরও প্রয়োজন। তুমি যাহা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা লাভে সহস্র সহস্র লোক চেষ্টা করিতেছে। সংসারে তোমার অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তুমি জল, বায়ু, আলোক ব্যতীত অনায়াসে কিছুই লাভ করিতে পার না। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। আবার দেখ, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার উপযোগী সমস্ত কার্য্য তুমি স্বয়ং কখন করিতে পার না। শস্যোৎপাদন, বস্ত্র-বয়ন, গৃহ-নির্ম্মাণ, জ্ঞানলাভ ইত্যাদি সহস্র কার্য্যে অন্যের সাহায্য আবশ্যক। সে সাহায্য কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? বিনা মূল্যে বা বিনা বিনিময়ে তাহা পাইতে পার না। মূল্যদান বা বিনিময় কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিবে? অর্থ*

* যাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করা যায়, তাহাকে অর্থ কহে। অষ্টম অধ্যায় দেখ।

ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। অর্থ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অর্থ উৎপাদনের উপায় পরিশ্রম।

পরিশ্রম দ্বিবিধ,—শারীরিক ও মানসিক। শরীর মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যেক শারীরিক পরিশ্রমে কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম এবং প্রত্যেক মানসিক পরিশ্রমে কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। অনেক প্রকার পরিশ্রমই বাহ্যিক পদার্থ অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার, মানব মন, মানব দেহ এবং বাহ্য জগতের গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সে সমস্তই পরিশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং পরিশ্রম ব্যতীত শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও অসম্ভব। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে পরিশ্রম আমাদের একটী প্রবল প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি, পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরিশ্রম সময় সাপেক্ষ। এক্ষণে, শরীর, মন, সময় ও পরিশ্রমের বাহ্যিক উপাদান, যতই উপযুক্ত ফলোপধায়ী কার্য্যে নিয়োজিত করিবে—কর্ত্তব্য পালনে নিয়োজিত করিবে—ততই অভাব দূর হইবে, সুখ বৃদ্ধি হইবে; এবং যে পরিমাণে তাহাদের অপচয় হইবে, সেই পরিমাণে অনটন ও অভাব ও তাহার আনুসঙ্গিক

যাতনা উপস্থিত হইবে। অতএব অপচয় করিও না—অভাব হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

"অপচয় করিও না—অভাব হইবে না।"

ইহা একটী পুরাতন কথা। কিন্তু পুরাতন হইলেও ইহার অর্থ অতি গভীর। যদি অপ্রয়োজনে নষ্ট না কর তবে প্রয়োজনে অনাটন হইবে না। এই বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি লোকে কার্য্য করে, তবে প্রচুরতা সমাগমে সংসারের অনেক ক্লেশ, অনেক যাতনা চলিয়া যায়—সুখ বৃদ্ধি হয়—বিশৃঙ্খলা দূর হয়—অভাব জনিত যাতনায় সমাজের শান্তি ভঙ্গ ও স্বাস্থ্য দূষিত হয় না।

'সময় নাই,' 'সময় নাই'—এই ধ্বনি সংসারে সর্ব্বদাই শুনা যায়। 'সময় অভাবে এই কার্য্য হইল না', 'সময় অভাবে ঐ কার্য্য করিতে পারি নাই'—এইরূপ অনুতাপ-সূচক বাক্য বহুল পরিমাণে প্রতিদিন বাতাসে মিলিয়া যাইতেছে। এই জন্য কত যাতনা—কত বিভ্রাট।

সত্য সত্যই কি সময় এত অল্প? সময়ের নামান্তর কাল। অথবা সময় কালের অভ্যন্তরবর্ত্তী। কাল ত অনন্তরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উন্নতি, অবনতি, ক্ষুদ্র কার্য্য, মহৎ কার্য্য—যাহা কিছু হইয়াছে—যাহা কিছু হইতেছে—সকলই কালের অভ্যন্তরে; সমস্ত মানব সমাজ—সমস্ত পৃথিবী—কাল সাগরে ভাসিতেছে। কে বলিবে কাল অল্প? কাল অসীম—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত,—তাহার অবসাদ নাই—বিরাম নাই—ক্ষয় নাই—ধ্বংস নাই।

কাল অসীম হইলেও মানব-জীবন সীমাবদ্ধ। কালের যে ক্ষুদ্র অংশে মানব-জীবনের বিস্তৃতি, সেই ক্ষুদ্র অংশ টুকুই মনুষ্যের সময়। যে মনুষ্য যতদিন সংসারে বিচরণ করে, তাহার সময় ততদিন। তাহার জীবন দ্বারা, তাহার সম্বন্ধে, কাল সীমাবদ্ধ। এই জীবিত কালের মধ্যে তাহাকে যাহা কিছু করিবার সকলই করিতে হইবে। কিন্তু তাহাই কি জীবন-কার্য্য সমাধান জন্য অপ্রচুর? তোমার সময়ের প্রয়োজন ততদিন যতদিন তুমি কার্য্য করিতে পার। যাঁহারা কার্য্যপ্রিয়—যাঁহারা কার্য্যকুশল—তাঁহারা এই সময়েই প্রচুর ও মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা

নিশ্চেষ্ট ও অপব্যয়ী, তাহাদের জীবন, 'সময় অভাবে হইল না'—'উপায় অভাবে পারিলাম না'—এইরূপ অমূলক আক্ষেপেই কাটিয়া যায়।

মনুষ্যের সুবিধার জন্য মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, বৎসর ইত্যাদি ভাগে সময় বিভাজিত হইয়াছে। এ ভাগ সকলের পক্ষেই সমান,—কোন তারতম্য নাই। যতক্ষণে অন্যের মিনিট, ঘণ্টা, বা দিন পূর্ণ হয়—যতদিনে অন্যের মাস ও বৎসর পূর্ণ হয়, ঠিক ততক্ষণে ও দিনে তোমার ঘণ্টা, মিনিট, দিন, মাস ও বৎসর পূর্ণ হয়,—কোন ভেদ নাই। ইহা সত্য বটে সকলের জীবন সমস্থায়ী নহে। কিন্তু জীবিতকাল যেমন অন্যের আয়ত্তাধীন, তেমনি তোমারও আয়ত্তাধীন। সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুসারে সে সময়ের সদসদ্ব্যবহার করিতে পারে। যে পরিমাণে তুমি উপযুক্ত কার্য্যে—কর্ত্তব্য পালনে—সময় নিয়োজিত করিবে, সেই পরিমাণে তোমার জীবনের সদ্ব্যয় হইবে ;—যে পরিমাণে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিবে, বা অপকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে, সেই পরিমাণে জীবন বৃথা নষ্ট হইবে।

সময়ের অল্পতার জন্য বিলাপ ত সর্ব্বদা শুনা যায়। সময় যদি অল্প হয় তবে অতি যত্নে তাহার যথাযথ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—এক মিনিটও বৃথা

যাইতে দেওয়া উচিত নয়। যতটুকু সময় বৃথা নষ্ট হইল, ততটুকু জীবন বৃথা বহিয়া গেল। অতীত জীবনে একবার পুনর্দৃষ্টি করিয়া দেখ দেখি, অল্প জ্ঞানে—বহুমূল্য জ্ঞানে—সময়ের যথোচিত ব্যবহার করিয়াছ কি না। তুমি স্তম্ভিত হইবে—ব্যথিত হইবে—যখন দেখিবে যে অতীত জীবন, আপনাকে অমর মনে করিয়া ব্যয় করিয়াছ! কত সময় আলস্যে, অনিশ্চিততায়, নিরুদ্যমে, বৃথা কার্য্যে, অনিষ্টকর কার্য্যে, ব্যয় করিয়াছ; কত সময় স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গে রোগ যাতনায় নষ্ট হইয়াছে! সেই সমস্ত সময়ের সমষ্টি করিলে তোমার অতীত জীবনের এক গুরুতর অংশ শূন্যময় দেখিবে। যদি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে, আজ এ দুর্দ্দিনে বিলাপ করিতে হইত না,—তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই অন্য প্রকার হইত।

সংসার কার্য্যক্ষেত্র। অল্প হউক বা অধিক হউক, কার্য্য না করিলে পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব। সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাই,—কয়েকজন সামান্য কৃষকের আবাস ভুমি, কুটির-গঠিত নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গ্রাম, বা বহুজনাকীর্ণ অট্টালিকা-সুশোভিত ব্যবসায়-কোলাহলপূর্ণ বৃহৎ নগরী—গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগীয় কার্য্যের ধুমধাম, বা

গৃহস্থের ক্ষুদ্র গৃহ ব্যাপার—বৃহৎ মহাজনদিগের বিস্তৃত ব্যবসায়ের অবিরাম ও দ্রুতগামী কার্য্যস্রোত, বা গ্রাম্য বণিকের ক্ষুদ্র দোকানের ধীরগামী কার্য্য-গতি—কৃষকের শস্যোৎপাদন—পণ্ডিতের জ্ঞানানুশীলন—ধনীর সুখান্বেষণ,—সকলই কার্য্যমূলক। বিনা কার্য্যে, বিনা শ্রমে কিছুই হয় নাই। প্রকৃতি-দেবীও সদা ব্যস্ত; তাহার অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানময়ী অনন্ত শক্তি অবিরামে চিরদিনই ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালিতেছে।

কার্য্য! কার্য্য! কার্য্য! সংসারে কার্য্য ব্যতীত আর কি আছে? কার্য্যই মানুষের ভাগ্য। ধন মান কার্য্যমূলক—সুখ কার্য্যমূলক—জ্ঞান কার্য্য-মূলক—ধর্ম্ম কার্য্যমূলক। অতএব কার্য্যে কখন পরাঙ্মুখ হইবে না। ছোট কার্য্য হউক, বড় কার্য্য হউক, তুমি যখন যে অবস্থায় পতিত, সেই অবস্থার অনুযায়ী ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য আনন্দ মনে করিবে। তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। তাহাই যদি তুমি মনোযোগের সহিত, পরিশ্রমের সহিত, উত্তম-রূপে করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইবে। দুঃখী কৃষক প্রাণপণে ভূমি কর্ষণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। মহারাজাধিরাজ চিন্তা, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে রাজ-কার্য্য পরিচালন

করিয়া—প্রজা পালন করিয়া—কর্ত্তব্য পালন করেন। কেহ জ্ঞানবলে, কেহ বাহুবলে, কেহ ধন বলে—যাঁহার যেরূপে সাধ্য—কর্ত্তব্য পালন করেন।

তুমি বলিবে :—"আমার মস্তকে এত কার্য্যের ভার যে আমি তাহা কোনরূপে বহন করিতে পারি না"। তোমার উপর গুরুভার সত্য বটে। অনেক কার্য্য তোমার করণীয় সত্য বটে। কিন্তু মস্তকের ভার দূরে নিক্ষেপ করিলে ত অব্যাহতি নাই—জীবন কাটাইতেই হইবে,—ইচ্ছা কর বা না কর, অবস্থা-সংগ্রাম করিতেই হইবে। যদি অব্যাহতি সম্ভব, তবে তাহা মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের পথে। সংসারের গতি এই। অতএব নিরাশ হইও না, যথাসাধ্য চেষ্টা কর—যাহা অন্যে করিয়াছে তাহা তুমিও করিতে পার। অপচয় নিবারণ কর—শ্রম বিভাজন কর—মুখ্য গৌণ বিবেচনায়, আবশ্যক অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রত্যেক কার্য্যের জন্য কিছু সময় নিরূপিত কর—প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া সাহসের সহিত অবিরামে কার্য্য কর; দেখিবে, যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইয়াছে—যাহা কঠিন ছিল তাহা সহজ হইয়াছে—যেখানে নিরাশা ছিল সেখানে আশা সঞ্চারিত হইয়াছে—যেখানে নিশ্বাস ফেলিবার

সময় ছিল না সেখানে বিশ্রামের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তুমি বলিবে:—"আমার উপায় নাই, সহায় নাই, কিরূপে সংসারভার বহন করিব—কর্ত্তব্য পালন করিব"? ইহা নিশ্চয় যে উপায় অভাবে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না;—কিন্তু সংসারে কয় ব্যক্তির নিকট উপায় আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়? যদি উপায় নাই, তবে উপায় উৎপন্ন করিবার জন্য পরিশ্রম কর—যত্ন কর—সময়ের সদ্ব্যবহার কর—পূর্ণ-মনোরথ হইবে। তোমার নিজ কার্য্যে তুমি স্বয়ং যত্নশীল না হইলে আর কে হইবে? অনেক সময় সহায়তার প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাও বিনা চেষ্টা, বিনা যত্নে লাভ করা যায় না। সহায়তা পাইলে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার জন্য কখনই নিশ্চেষ্টভাবে প্রতীক্ষা করিবে না—সময় নষ্ট করিবে না। আপনার সহায় আপনি হও। ন্যায় পথে থাকিয়া ক্রমাগত উদ্দেশ্য সাধনে —কর্ত্তব্য পালনে—পরিশ্রম কর;—দেখিবে, আশাতীত ফল লাভ করিয়াছ। যতক্ষণ পরিশ্রম করিতে পার ততক্ষণ নিরাশার হেতু নাই।

তুমি বলিবে:—"সংসারে অর্থ বিনা কোন কার্য্যই হয় না। গভীর অনাটন, কিরূপে জীবন

কাটাইব—কর্ত্তব্য পালন করিব?” সত্য বটে, বিনা অর্থে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তুমি অর্থ অনাটনে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার নাই। কিন্তু একবার সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে কয় ব্যক্তি পূর্ব্ব সঞ্চিত ধনে অধিকারী হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছে? অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—কোন্ স্থানে বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা সঞ্চয়শীলতায় অনাটন দূর হইয়াছে—অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে? যদি এই উপায়ে অন্য লোকে অর্থ উপা-র্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, তবে তুমি কেন তাহা না পারিবে? তুমি কি কখন ভাবিয়াছ যে আলস্যই অভাবের প্রসূতি? পুনরায় অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি, অবস্থানুযায়ী দিন যাপন করিয়াছ কি না? যখন যে অবস্থায় পতিত সেই অবস্থানুযায়ী পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়াছ কি না? কত সময় সুখলাভের বা মর্য্যাদা রক্ষার ভ্রম-সঙ্কুল বিবেচনায় অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করিয়াছ? কতবার বিনা প্রয়োজনে—বৃথা কার্য্যে—ব্যয় করিয়াছ? যাহা অপচয় করিয়াছ তাহা যদি এখন তোমার হস্তে থাকিত, তবে কি আজ তোমাকে অভাব-পীড়িত হইতে হইত?

সর্ব্বপ্রকার অপচয় নিবারণ কর,—অনাটনের স্থানে প্রচুরতা আসিবে—প্রচুরতা সমাগমে কর্ত্তব্য পালনে অধিকতর সমর্থ হইবে এবং প্রকৃতরূপে সম্ভ্রান্ত ও সুখী হইবে।

সংসার বিচিত্রতাময়। এখানে সকলের অবস্থা কখন সমান হইতে পারে না। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী, পণ্ডিত, মূর্খ,—সকলেই সংসারে অবস্থান করিতেছে। আবার, সংসারে অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে। মানবের ভাগ্যচক্র ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইতেছে। কাহারও অবস্থা চিরদিন সমভাবে থাকা সম্ভব নহে। অথচ কর্ত্তব্য পালন জন্য —অন্ততঃ জীবন ধারণ জন্য—সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় দুরবস্থা বা প্রতিকুল ঘটনাবলীর জন্য শিরে করাঘাত বৃথা। অনেক সময় সে সকল তোমার ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল প্রকাশ্য ও অজ্ঞাত শক্তিবলে মানব-সমাজ-যন্ত্র চলিতেছে, তোমার অবস্থা ও চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলী, সেই সকল শক্তির বা তাহার কতকগুলির ফলমাত্র। অনেক সময় তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিতে পার না। তোমার কর্ত্তব্য সহজ। যখন তুমি যে অবস্থায় পতিত, তোমার চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনা-বলী তোমার অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক,

তুমি সেই অবস্থাকেই আলিঙ্গন করিবে। তোমার যতটুকু শক্তি আছে, যে কিছু উপায় আছে, সেই শক্তি, সেই উপায় তুমি সম্পূর্ণরূপে চালিত করিবে এবং সম্মুখে মহৎ লক্ষ্য রাখিয়া অবিরামে কার্য্য করিবে,—সর্ব্ব প্রকার অপচয় নিবারণ করিবে। ইহাতেই তুমি কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইবে—সুখী হইবে—উন্নত হইবে। বৃথা বিলাপে কেবল তোমার শরীর মন নষ্ট হইবে—সর্ব্বনাশ হইবে। বিলাপ কেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ?—সুখ হইল না বলিয়া? বিলাপের পথে সুখ নাই, অপচয় ও অধোগতি;—কার্য্যের পথে সুখ—কার্য্যের পথে উন্নতি।

সংসারে সুখ সকলেই চায়, কিন্তু কি উপায়ে সুখ লাভ হয় এ বিষয়ে নানা মত। কেহ ধনে, কেহ মানে, কেহ যশে, কেহ বিদ্যায়, কেহ ধর্ম্ম-চিন্তায় সুখ লাভের আশা করিয়া থাকেন। ইহার প্রত্যেক বিষয়ে অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখ উপর্জিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামঞ্জস্যভাবে ঐশিক নিয়ম ও কর্ত্তব্য পালন ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণতা হইতে পারে না। এমন লোকও দৃষ্টি-গোচর হয় যাহাদের মতে ইচ্ছামত আহার বিহারেই সুখ! বিষম ভ্রম! ইহা ইন্দ্রিয়পরায়ণের কথা।

সুখ লাভের এ পথ নহে। বিনা পরিশ্রমে—বিনা কর্ত্তব্য পালনে—সুখলাভ অসম্ভব।

তুমি শরীর মনে জড়িত জীব। শরীরের কতকগুলি প্রাপ্য আছে, মনেরও কতকগুলি প্রাপ্য আছে। শরীরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাহাকে না দিলে সে আর্ত্তনাদ করিবে, তোমার প্রতিবাদী হইবে, যথোচিতরূপে তোমার কার্য্য করিবে না, হয়ত অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শরীরের যথোচিত বিকাশ ও সবলতা না হইলে মনও উপযুক্তরূপে কার্য্যক্ষম হইবে না। যদি মনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাহাকে না দাও, যদি তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ সাধনে যত্নবান না হও, তবে নানা অমঙ্গল ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে—তুমি জড়বৎ হইবে—জীবন বৃথা হইবে। অতএব শারীরিক ও মানসিক শক্তিসকল সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত করিতে যত্নবান হও—মনোবৃত্তিগণের বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন কর—যে শক্তি, যে বৃত্তি যে উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে ন্যায়সঙ্গতরূপে সেই উদ্দেশে প্রয়োগ কর—দিন দিন নূতন জ্ঞান লাভে উন্নত হও—জ্ঞানালোকিত মনের দাসরূপে শরীর চালিত হউক—শরীর মন সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য-পালনে নিয়োজিত হউক। এইরূপে আপনার

নিয়ৃতি পূর্ণ করিতে যত্ন কর। ইহাতেই সুখ—ইহাতেই উন্নতি। যে পরিমাণে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইবে, সেই পরিমাণে সুখ দূরবর্ত্তী হইবে।

যখন জীবন ধারণ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি পরিশ্রম সাপেক্ষ, তখন পরিশ্রমে কদাচ বিমুখ হইও না। পরিশ্রম সময় সাপেক্ষ। সময় সীমাবদ্ধ, কারণ জীবন অল্পকাল স্থায়ী। কিন্তু অল্প হইলেও জীবিতকাল কাহারও পক্ষে অপ্রচুর নহে। যদি জীবনের অপচয় নিবারণ করিতে পার, নিশ্চয়ই প্রচুরতা লাভ করিবে। জীবন-ব্যাপ্তি যতদিন, সময়ও ততদিন। হে পাঠক! ইহা অপেক্ষা অধিক সময়ে কি তোমার প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, তবে অনন্ত কাল তোমার সম্মুখে। অথবা তুমি কি চাও যে অন্য লোক অপেক্ষা তোমার ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন হয়? যদি ইচ্ছা কর, তবে নিজ জীবিতকাল দীর্ঘায়তন ঘণ্টা দিন মাস বৎসরে বিভাজিত করিতে পার; কিন্তু হায়! তোমার জীবনের ব্যাপ্তি ইচ্ছানুসারে দীর্ঘ হইতে পারে না—কিছুতেই শত বর্ষ স্থানে দুই শত বর্ষ হইতে পারে না।

"বহিয়া জীবন-স্রোত কাল-সিন্ধুপানে ধায়,
ফিরাব কেমনে"?

অসম্ভব! অসম্ভব!—কিছুতেই ফিরাইতে পার না। অতএব সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা অচিরাৎ পালনে যত্নবান হও—এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও জীবন বৃথা অতিবাহিত করিওনা। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সর্ব্বপ্রকার অপচয় নিবারণ চেষ্টা কর এবং ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হও। যদি জীবন-অপচয় নিবারণ করিতে পার—অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সহকারে, ন্যায়জ্ঞান সহায়ে, কার্য্য করিতে পার—তবে নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইবে—উন্নত হইবে—সুখী হইবে। অপচয়ই সর্ব্বপ্রকার দারিদ্রের মূল। অতএব "অপচয় করিও না—অভাব হইবে না"।

অপচয় তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; মানসিক অপচয়, শারীরিক অপচয়, এবং আর্থিক অপচয়। আমরা অতঃপর এই তিন বিষয়ের পৃথক পৃথক পর্য্যালোচনা করিব। অপচয় নানা কারণে উৎপাদিত হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমুদয়ের উল্লেখ অসম্ভব। আমরা কেবল অপচয়ের মূলীভূত কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

মানসিক অপচয়।

মানবের মন এরূপভাবে গঠিত যে অবিরামে তাহার ক্রমোন্নতি হইতে পারে—দিন দিন জ্ঞান-সীমা বর্দ্ধিত হইতে পারে—নূতন নূতন চিন্তাজগৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে পারে। মন সদা জাগ-রিত ও ক্রিয়াবান। কোন না কোন বিষয়, কোন না কোন ভাব, মনে সদা বিরাজমান—তাহার শূন্যাবস্থা নাই। মনুষ্যের জ্ঞান ও চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা অনুসারে মনে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। যে কোন কার্য্য কর, প্রথমে মনের ক্রিয়া ও আদেশ আবশ্যক। কখন তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কখন বা যায় না। কোন্ কার্য্য করা প্রয়োজন? বিচারকর্ত্তা মন। কিরূপে তাহা করা আবশ্যক? বিচারকর্ত্তা মন। তাহাতে কি ফল হইবে? বিচারকর্ত্তা মন। যখন কোন কার্য্য করিতে হইবে তখন মনকে সেই দিকে উন্মুখ করা আবশ্যক।

মন-পরীক্ষা।—মন ত সদা জাগরিত ও ক্রিয়াবান এবং দেহযন্ত্রের নেতা। কিন্তু মনে যে

সকল চিন্তা, যে সকল কল্পনা সর্ব্বদা উদয় হইতেছে তাহার সহিত তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের কতদূর সংযোগ আছে? তাহাতে তোমার কর্ত্তব্য পালনের কতদূর সুবিধা হইতেছে? তাহা দ্বারা তুমি উন্নত হইতেছ কি অবনত হইতেছ? এইরূপে মনের প্রক্রিয়া পরীক্ষা কর; একবার দুইবার নয়, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা কর।

এইরূপে মনের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, তোমার মনের উন্নতি বা অধোগতি—সবলতা বা দুর্ব্বলতা—কর্ত্তব্য সাধনের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা—জীবনের সদ্ব্যয় বা অপচয়—মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা অবিরামে হইতেছে। তুমি দেখিবে যে, তোমার সময়ের কত অংশ, অথবা তোমার জীবনের কত অংশ, দূষিত চিন্তায়, বৃথা চিন্তায়, অসম্ভব কল্পনায়, অনিশ্চিততায়, মনঃসংযোগ-শক্তির অভাবে বৃথা, বৃথা অতিবাহিত হইতেছে,—কিরূপে তাহা শত্রুভাবে তোমার উন্নতির পথ রোধ করিতেছে—কর্ত্তব্য পালনে বিরোধী হইতেছে—তোমার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছে!

মনঃসংযোগ।—প্রথমে তোমাকে মনঃসংযোগের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। যে কার্য্য করিবে তাহা মন দিয়া করিবে ইহা অতি সাধারণ

কথা। কিন্তু মানসিক প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, প্রকৃত মনঃসংযোগ অভাবে তোমার কত সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে—তুমি কত উন্নতি, কত সুখে বঞ্চিত হইতেছ—কত কার্য্য, যাহা সহজে সুচারুরূপে করিতে পারিতে, কষ্টে সামান্যরূপে করিতেছ।

ভালরূপে মন নিয়োজিত করিতে না পারিলে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। যদি কার্য্য করা আবশ্যক হয়—ভাল করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক হয়—সময়ের অপচয় নিবারণ করা আবশ্যক হয়—তবে যখন যে কার্য্য করিবে তাহাতে বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করিবে—অনন্য-মনা হইয়া সে কার্য্য করিবে। যদি তাহা করিতে পার, তবে সকল কার্য্যই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে করিতে পারিবে, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক শক্তির সাশ্রয় হইবে এবং তোমার কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে।

মনঃসংযোগ-শক্তি জ্ঞান লাভের ও সর্ব্ব প্রকার উন্নতিলাভের প্রধান উপায়। এই শক্তির প্রবলতা ব্যতীত তুমি কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পার না। বুদ্ধি, প্রতিভা মনঃ-

সংযোগ ব্যতীত দীপ্তিমান হইতে পারে না। যে সকল মনুষ্য জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন—বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যবস্থা, যে বিভাগে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন—প্রতিভা-বলে মানবসমাজ আলোকিত করিয়াছেন—তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখিলে, জ্ঞাত হওয়া যায় যে মনঃসংযোগ-শক্তিই তাঁহাদের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রধান সহায়।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার কর্ত্তা মহানুভব নিউটনের মনঃসংযোগ অতি গভীর ছিল। তিনি যখন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিপাদ্যে মনোনিবেশ করিতেন, তখন অন্য কোন বিষয়ই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারিত না। কখন কখন তিনি প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে, এমন কি প্যাণ্টুলনের ভিতর একটী মাত্র পদ চালনা করিয়াই, বিছানার উপর বসিয়া পড়িতেন—গভীর চিন্তামগ্ন হইতেন,—কয়েক ঘণ্টা এইরূপে অনন্যমনা হইয়া কার্য্য করিয়া পরে যথোচিতরূপে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। অনেক সময় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ভোজ্য সামগ্রী ৩।৪ ঘণ্টা যাবত মেজের উপর পড়িয়া থাকিত। একদা তাঁহার বন্ধু ডাক্তার ষ্টুকলি আসিয়া উপ-

স্থিত হইলেন। নিউটন তখন পঠনা-গৃহে গভীর চিন্তামগ্ন। ডাক্তার, ভোজনগৃহে আনীত হইলেন। অনেক বিলম্ব হইল তথাপি নিউটন পঠনাগৃহের বাহির হইলেন না। মেজের উপর, নিউটনের আহার জন্য, একটী সিদ্ধ পক্ষী রক্ষিত ও আবরিত ছিল। ডাক্তার সেটী ভোজন করিয়া হাড়গুলি পাত্রের উপর রাখিয়া, পূর্ব্ববৎ পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিউটন ভোজন গৃহে আসিয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন :—"আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়াছি"। ভোজন পাত্রের আবরণ উঠাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকখানি হাড় মাত্র পতিত রহিয়াছে। তখন ঈষৎ হাস্যমুখে বন্ধুকে বলিলেন :—"আমি ভাবিয়াছিলাম আহার করি নাই, এখন দেখিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছে।"

আরকিমিডিস নামক গ্রীক পণ্ডিতের মনঃসংযোগ অতি প্রগাঢ় ছিল। তিনি সিরাকিউজ নগরে অবস্থানকালে, মারসিলস ঐ নগর আক্রমণ করেন। যখন আক্রমণকারী সেনাদল নগর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তিনি জ্যামিতির প্রতিপাদ্য প্রমাণে ব্যাপৃত ছিলেন। নগর গ্রহণের গোলমালে কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। এই চিন্তামগ্ন অবস্থায় একজন সৈনিক তাঁহার প্রাণবধ করে।

রাজা রামমোহন রায়ের মনঃসংযোগ-শক্তি অতি প্রবল ছিল। পিতৃগৃহে অবস্থানকালে তিনি একদিন বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ কখন পাঠ করেন নাই। বেলা একপ্রহর, দ্বিপ্রহর গত হইল—মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতীত হইয়া গেল—তখনও তিনি নির্জ্জনগৃহে পঠনামগ্ন। দিবা তৃতীয় প্রহর অবসানে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিয়া আহারাদি ক্রিয়া সমাপণ করিলেন।* কলিকাতা অবস্থানকালে তিনি একদিন একজন নাস্তিকের সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত দিন অনাহারে অবিশ্রান্তে নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।†

অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয়ের ন্যায় মনঃসংযোগও শিক্ষার বিষয়,—চেষ্টা দ্বারা অভ্যাস করা যাইতে পারে। একদিনে না হউক—দুই দিনে না হউক—যদি দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই কিছু দিনে সফলযত্ন হইবে।

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা।

† Biographical Essays by F. Max Muller, London. 1884. Page 17.

যখন মনঃসংযোগের উপর তোমার বর্ত্তমান ও ভাবী মঙ্গল এত অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তখন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা অভ্যাস করা আবশ্যক।

তুমি স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবে:—"মনঃসংযোগ কিরূপে অভ্যাস করা যাইতে পারে?" যখন কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইবে, তখন মন হইতে অপরাপর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা দূর করিয়া দিবে। যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে কেবল সেই বিষয়ক চিন্তা মনে স্থান পাইবে, যেন তুমি ও তোমার মনের সম্মুখে সেই বিষয়টী বিদ্যমান আছে,—চতুর্দ্দিকস্থ অপরাপর সমস্ত ব্যাপার অস্তিত্বহীন হইয়াছে। কুরুপাণ্ডবদিগের বাণ শিক্ষার আখ্যায়িকায় এ বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। বাণ সন্ধান জন্য দ্রোণাচার্য্য এক বিশাল বৃক্ষের অগ্রভাগে একটী পক্ষী রাখিয়াছিলেন। দ্রোণ প্রত্যেক শিষ্যকে পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তুমি কি দেখিতেছ"? অপরাপর সকলেই বলিলেন:—"বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি ও তাহার মধ্যে পক্ষী দেখিতেছি"। কেবল একমাত্র অর্জ্জুন বলিলেন:—"পক্ষী ব্যতীত আর কিছুই দেখি না"। দ্রোণ গুরু প্রীত হইলেন। ইহাই প্রকৃত মনোযোগ। একদিকে তোমার মন, অন্য দিকে তোমার

মনোযোগের বিষয়,—ইহার মধ্যবর্ত্তী আর কিছুই নাই।

মনের চপল-গতি।—মনঃসংযোগের প্রধান ব্যাঘাত এক সময়ে নানা চিন্তা ও কল্পনা। মনের এক প্রকার চপল-গতি আছে, সেই গতি বশতঃ অল্প-কালের মধ্যে মন সহস্র সহস্র বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। চপলগামী মনকে কোন বিশেষ বিষয়ে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না। সুতরাং মনঃ-সংযোগ অভ্যাস করিতে হইলে চপল-গতি দূর করিতে হইবে। যখন কোন উপস্থিত বিষয়ে অভি-নিবেশ করিতে হইবে, তখন অপরাপর সমস্ত বিষয়ক চিন্তা দূর করিয়া মনকে সেই বিষয়ের জন্য উন্মুক্ত ও একাগ্র করিতে হইবে। উপস্থিত বিষয় দ্বারা মনকে এরূপে বেষ্টন করিবে যেন অপর কোন বিষয়ক চিন্তা —যাহার সহিত উপস্থিত বিষয়ের কোন সংশ্রব নাই—তাহা ভেদ করিয়া মনে প্রবেশিতে না পারে। উপস্থিত বিষয়ের সহিত যে সকল বিষয়ের যোগ আছে, তাহা অবশ্যই উপস্থিত বিষয়ের সহিত মনে ধারণ করিতে হইবে—তাহাদের পরস্পর যোগ এবং লঘুত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ক চিন্তা অসম্পূর্ণ হইবে। তাহার মধ্যে যে গুলি উপস্থিত বিষয়ের অনুকূল ও

সহকারী, তাহাদিগকে মানসিক চিত্রের যথা স্থানে স্থাপন করিবে, অপরগুলিকে দূর করিয়া দিবে। সাবধান! যেন এমন কোন বিষয় মনে প্রবেশ করিতে না পারে, যাহার সহিত উপস্থিত বিষয়ের কোন সংশ্রব নাই।

অসংলগ্ন বিষয়ক চিন্তা যদি দূর করিতে না পার, তবে উপস্থিত বিষয়ে প্রকৃতরূপে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না এবং তাহা ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্ব হইতে অভ্যাস না করিয়া থাক—যদি মনের চপলগতি প্রবল হইয়া থাকে—তবে বিশেষ চেষ্টা ও দৃঢ়তা ব্যতীত মনঃ-সংযোগ অভ্যাস করিতে পারিবে না। কিন্তু অল্প-দিনের চেষ্টা বিফল হইলেই নিরাশ হইও না—নিরাশার কোন হেতু নাই। অনেক সময়ে অলক্ষিত-ভাবে অসংলগ্ন বিষয় মনে উপস্থিত হয়। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত মনোনিবেশ অভ্যাস করিতে হইবে। যেমন অসংলগ্ন বিষয়ক চিন্তা মনোদ্বারে উপস্থিত হইবে, অমনি প্রবল শক্তির সহিত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে দৃঢ়তার সহিত কিছুদিন চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সফল-যত্ন হইবে। যদি অনিষ্টকারী অভ্যাসকে দমন করিতে

না পায়, তবে তুমি মনুষ্যত্বহীন, ভীরু, কাপুরুষ। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? অতএব বীরভাবে শত্রু নাশের চেষ্টা করিবে।

চপল-গতি প্রবল হইলে মন সদা শত শত বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোন বিষয়েই বিশেষরূপে একাগ্র ও আনুপূর্ব্বিক ভাবে নিবিষ্ট হইতে পারে না; সুতরাং সে মনঃ-প্রসূত কোন কার্য্যই সুন্দর ও সুগঠিত হয় না। যখনই তুমি কোন বিষয়ে অভি-নিবেশ চেষ্টা কর, অমনি ব্যাঘাতকারী নানা শত্রু আসিয়া চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করে। ব্যাঘাত-কারিগণের মধ্যে এমন কতকগুলি ভাবনা ও কল্পনা-চিত্র আছে, যাহা আশু সুখকর এবং যাহা অনেক দিনের পরিচিত। তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। তুমি এমন কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত আছ যাহা অচিরাৎ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, নতুবা মহান্ অনিষ্টপাত হইবে। এরূপ সময়ে, যদি তোমার দুই চারি জন বন্ধু, আমোদ প্রমোদ উদ্দেশে, তোমার নিকট উপ-স্থিত হন, তবে তুমি কি করিবে? কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং আমোদ প্রমোদও নিশ্চিন্ত মনে হইবে না, সুতরাং তাহা

হইবে না ? সম্ভবতঃ তুমি বন্ধুদিগকে বলিবে :— "ভাই ! এখন আমি বড় ব্যস্ত, একার্য্য শীঘ্র শেষ করা আবশ্যক ; অন্য সময়ে আমোদ প্রমোদ করিব।" যখন কোন বিশেষ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতেছ তখন যদি অন্যবিষয়ক চিন্তা—সুখকর পূর্ব্বপরিচিত চিন্তা— আসিয়া তোমাকে প্রলোভিত করে, তবে তুমি ঠিক সেইরূপে তাহাদিগকে বিদায় দিবে। যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতেছ, তাহা শেষ করিয়া, অথবা তাহা যদি দীর্ঘ বা গুরুতর বিষয় হয়, তবে তাহার জন্য প্রতিদিন যে সময় নিরূপিত আছে, তাহা অতিবাহিত হইলে, ঐসকল সুখকর বা পরিচিত চিন্তাকে আবাহন করিতে পার এবং একে একে প্রত্যেকের সহিত যথোচিতরূপে সম্মিলিত হইতে পার। ইহাতে সর্ব্বাংশে তোমার মঙ্গল ও সুখ বর্দ্ধিত হইবে।

চপল-গতি অভ্যস্ত ও পুরাতন হইলে ক্রমে মনের এরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে, যখন যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হও, মন যেন স্থানান্তরে গিয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যে কোন কার্য্য কর, মনের অনুপস্থিতিভাব বশতঃ, তাহা অসম্পূর্ণ, ভ্রমপূর্ণ এবং বিলম্বে সম্পাদিত হয়। ইহা মনের পীড়িত ও শোচনীয় অবস্থা। এমন অবস্থায় যে কত সময়

বৃথা নষ্ট হয়—জীবনের কত অংশ শূন্যময় হয়—কত অবনতি, কত ক্ষতি, কত ক্লেশ উৎপন্ন হয়—একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। অতএব যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাও, জীবন-অপচয় নিবারণ করিতে চাও, মনের চপল-গতি নিবারণ কর—মনঃসংযোগ অভ্যাস কর।

স্মরণশক্তি।—এই স্থলে মেধা বা স্মরণশক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মেধা মনের এক প্রবল শক্তি এবং জীবন ধারণ জন্য ইহা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আমরা কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। কাহারও মেধা অত্যন্ত প্রখর, কাহারও বা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। মেধার প্রাখর্য্য বা দুর্ব্বলতা মানবের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় পৈতৃক গুণ, শিক্ষা, চালনা, চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ সময়ের বিস্তর অপচয় হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় যে, স্মরণশক্তি সহায়ে যে কার্য্য অত্যল্প সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার ক্ষীণতায় সেই কার্য্য সম্পাদনে প্রভূত সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং যাহাতে স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে করা আবশ্যক।

অনেকের মতে স্মরণশক্তির প্রবলতায় বুদ্ধি-বৃত্তির ক্ষীণতা হইয়া থাকে,—প্রবল মেধা ও প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি একত্রে প্রায় কোন মনে সন্নিবেশিত থাকে না। এই মতের পোষকতায় অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল লোকের মেধা অত্যন্ত প্রখর, সম্ভবতঃ তাঁহারা সেই শক্তি প্রভাবে, পুস্তকাদি পাঠে ও অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া, এরূপ অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, যাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল-স্মৃতি মনুষ্যকে চিন্তা ও যুক্তিদ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়; সুতরাং বুদ্ধির ভূয়সী পরিচালনা না হওয়ায়, তাহা অনেক পরিমাণে অস্ফুট থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী, তাঁহারা মেধা শক্তির যথোচিত পরিচালনা ও বিকাশ সাধনে সর্ব্বদা অনুরক্ত নহেন। আমাদের বিশ্বাস যে, যদি প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা মনের বিকাশ সাধিত হয়, তবে উভয় শক্তিই যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে; এবং উভয় শক্তি পরস্পর সহকারিতা করিয়া জ্ঞান লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া দিতে পারে। যে বিষয়ের তাৎপর্য্য অনুভব করা যায় নাই, যাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই, তাহা মনে ধারণ করা বড় কঠিন। এরূপ স্থলে বুদ্ধি স্মরণশক্তির সহায় হইতে পারে। বুদ্ধিবলে

তাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, তাহাকে সহজে স্মৃতিগত করা যাইতে পারে। আবার বুদ্ধির ক্রিয়ার জন্য—কার্য্যকারণ নির্ণায়ক শক্তির ক্রিয়ার জন্য—অনেক ঘটনা, অনেক বিষয় মনে ধারণ করা আবশ্যক। সে সময়ে স্মরণশক্তি বুদ্ধির সহায়তা করিতে পারে। যে সকল মনুষ্য বিদ্যা বুদ্ধি বলে জগতে শ্রেষ্ঠতা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির মনে প্রবল মেধার সহিত প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি সমন্বিত ছিল।

লর্ড মেকলের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। বাল্যকালে তিনি আরব্য উপন্যাস এবং স্কট প্রণীত উপন্যাস মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণকে আমোদিত করিতেন। তাঁহার আবৃত্তি, পুস্তকদৃষ্টে পাঠ করার ন্যায় ভ্রমশূন্য হইত। তাঁহার মেধা দূরব্যাপ্ত ও নানা বিষয়-গত ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রণীত ইতিহাস, প্রবন্ধমালা, কবিতা, বক্তৃতা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ব্যবহার-সচীব (ল মেম্বর) মনোনীত হইয়া এদেশে আগমন করেন এবং অতি দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত নিজকার্য্য সম্পাদন করেন।

কে বলিবে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি ক্ষীণ ছিল?

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষার ও শাস্ত্রীয় বিচারের যে প্রকার পদ্ধতি ছিল, তাহাতে স্মরণ-শক্তি প্রখর না হইলে, কেহই কোন শাস্ত্রে সমীচীনা ব্যুৎপত্তি লাভে, পণ্ডিত সমাজে গণনীয় হইতে পারিতেন না। সে কালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। প্রবল স্মরণশক্তি-সত্ত্বেও প্রাচীন পণ্ডিতগণ দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক নানা গ্রন্থ প্রণয়নে, অগাধ চিন্তা-শক্তি ও অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলের অক্ষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপরে লর্ড মেকলের প্রবল স্মরণশক্তির কথা বলা হইয়াছে। ত্রিবেণী নিবাসী সুবিখ্যাত অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মেধা প্রবলতর ছিল। তিনি শিশুকালে ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি সমাপন করিয়া, ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। যে স্মৃতি-শাস্ত্র লোকে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমেও সমাপন করিতে সমর্থ হয় না, তিনি তাহা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে সমাপন করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে; তৎপরে ন্যায়-শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন প্রাচীন শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। এই শতাব্দির প্রথমে তাঁহার

মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এখনও লোকের মুখে তাঁহার অসাধারণ মেধা সম্বন্ধীয় গল্প শুনা যায়। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সম্মুখে একদা দুই জন ইংরাজ পরস্পর কলহ-পরায়ণ হইয়া ইংরাজি ভাষায় কে কাহাকে কি বলিয়াছিল, সময়ান্তরে, তিনি তাহা আদালতের সমক্ষে অবিকল বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইংরাজী জানিতেন না। * তাঁহার প্রণীত হিন্দু-ব্যবস্থা-শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ নামক পুস্তকে তাঁহার ভূয়োদর্শন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচার শক্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রণীত আর কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক আছে।

রাজা রামমোহন রায়ের মেধাশক্তি অতি প্রখর ছিল। এই শক্তি বলেই তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি কঠিন ও বিজাতীয় ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা অবস্থান কালে, এক জন পণ্ডিত তাঁহার সহিত তন্ত্র বিশেষের বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ তন্ত্র রাজার দৃষ্টি ছিল না। তিনি তাঁহাকে আগামী কল্য আসিতে বলিলেন। ইত্যবসরে ঐ গ্রন্থ আনাইয়া

* শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত প্রথম চরিতাষ্টক, ৩৮ পৃষ্ঠা।

তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া, পর দিন ঘোর বিচারে তান্ত্রিককে পরাজিত করিলেন। * কিন্তু তাঁহার মনে প্রবল মেধা শক্তির সহিত প্রবলতর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি সমন্বিত ছিল। তাঁহার জীবনের মহৎ কার্য্যে ও তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীতে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাহা শিক্ষা করিবে তাহা মনে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। যাহা প্রগাঢ় পরিশ্রমে অভ্যাস করিতেছ, তাহা যদি অচিরাৎ মন হইতে অপসৃত হইয়া যায় তবে পরিশ্রম বিফল হইল। ইহা স্মরণশক্তির প্রবলতার উপর নির্ভর করিতেছে। যথোচিত চর্চ্চা দ্বারা স্মরণশক্তি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সে চর্চ্চা কিরূপে করিব?—ঠিক সেইরূপে যেরূপে শিশুগণ পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। বালকগণ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি দ্বারা পাঠাভ্যাস করে। সকলের পক্ষেই এই নিয়ম। যখন কোন বিষয় স্মৃতিগত করিতে হইবে, তখন পুনঃ পুনঃ তাহার আবৃত্তি করা আবশ্যক। অর্থবোধের সহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া আবৃত্তি করাই অভ্যাস করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। যেরূপে আবৃত্তি দ্বারা

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রাম মোহন রায়ের জীবন চরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৮৯ পৃষ্ঠা।

অভ্যাস করা যায়, সেইরূপ আবৃত্তি ও আলোচনাই লব্ধজ্ঞানকে মনে সজীব রাখিবার প্রধান উপায়।

স্মরণশক্তির ক্রিয়া বহুলপরিমাণে মনঃসংযোগের উপর নির্ভর করে। যাহাতে উত্তমরূপে মনোনিবেশ করা যায় না, তাহা অভ্যাস করা বড় কঠিন ও কষ্টকর কার্য্য। যাহা মনঃসংযোগের প্রতিরোধক, তাহাই স্মরণশক্তি পরিচালনের ব্যাঘাতকারী। মনের চপলগতি স্মরণশক্তির মহাশত্রু। মেধার ক্রিয়ার জন্য চপলগতি প্রশমিত করা আবশ্যক।

যাহা অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা যদি উত্তমরূপে বুঝিতে না পার, মনের উপরে যদি সে বিষয়ের চিত্র পরিস্কার ও প্রবল রূপে পতিত না হয়, তবে কখনই তাহা শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না এবং কষ্টে অভ্যাস করিলেও তাহা দীর্ঘ কাল মনে রাখিতে পারিবে না।

যাহা শিক্ষা করিতেছ—স্মৃতিগত করিতেছ—তাহা অচিরাৎ মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা মনের যথা-স্থানে সজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিবে। নানা বিষয় অসম্বদ্ধভাবে মনে সমাবেশিত হইলে, শীঘ্রই তাহা অপসৃত হইয়া যায় এবং কার্য্যকালে সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রেণীবদ্ধ করিলে লব্ধজ্ঞানকে মনে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। পূর্ব্বে তুমি অনেক বিষয়

শিক্ষা করিয়াছ; এখন যাহা শিখিতেছ তাহার সহিত সেই সকল বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে? যেটীর সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেইটীর সহিত অধুনা-শিক্ষিত বিষয়টী সংযোজিত করিবে;—সমগুণবিশিষ্ট বিষয়কে সমগুণবিশিষ্ট বিষয়ের সহিত সংযোজিত করিবে। ইহাকেই শ্রেণীবদ্ধ করা বলে।

মনের এক প্রকার শক্তি আছে যদ্দ্বারা এক বস্তু দেখিয়া অপর বস্তু মনে পড়ে,—এক ভাব হইতে অপর ভাব উদয় হয়। তাহাকে ভাব-সহযোগ-শক্তি বলা যাইতে পারে। ভাব-সহযোগ-শক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক বিষয় স্মৃতিগত করা যাইতে পারে। এক বস্তুর সহিত যদি আর এক বস্তুকে সর্ব্বদা একত্রে দেখা যায়, তবে তাহার একটী বস্তু দেখিলে বা মনে হইলে, অপরটীও মনে হয়। যেমন, ফুল দেখিলে বা মনে হইলে তাহার গন্ধ মনে হয়,—আহার্য্য দেখিলে বা মনে হইলে তাহার আস্বাদ মনে হয়,—নদী বা পুষ্করিণী দেখিলে বা মনে হইলে মৎস্য মনে হয়,—বৃক্ষ দেখিলে বা মনে হইলে ফল, ফুল মনে হয়, ইত্যাদি। আবার, একজন পরিচিত মনুষ্যের আকৃতির সহিত একজন আগন্তুকের অবয়বের সৌসাদৃশ্য থাকিলে, আমরা ঐ শক্তির ক্রিয়া-

বশতঃ আগন্তুককে দেখিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে মনে করি এবং মনে মনে পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে সংযোজিত করিয়া রাখি এবং এই উপায়ে তাহার আকৃতি স্মরণ করিয়া রাখি। এইরূপে এক চিন্তা হইতে অপর চিন্তা, এক ভাব হইতে অপর ভাব, মনে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই উপায়ে আমরা নানা বিষয় মনে ধারণা করিয়া রাখিতে পারি। নানা বিষয়ক জ্ঞানকে মনে শ্রেণীবদ্ধ করা অনেক পরিমাণে এই শক্তির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

যে দিকে মনের স্বাভাবিক গতি—যে বিষয়ে মনের আসক্তি—সেই দিকে, সেই বিষয়ে স্মরণ শক্তির ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সর্ব্বদাই দেখা যায় যে বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের স্মরণ-শক্তি অতি প্রবল। এক বিষয়ে প্রবলতা ও অন্য বিষয়ে দুর্ব্বলতার অন্য কোন অর্থ নাই,—যে বিষয়ে মনের আসক্তি, সেই বিষয়েই মেধার প্রবলতা। সুতরাং যখন যে বিষয় অভ্যাস করিতে হইবে, যখন যে বিষয়ে চিন্তা বা কল্পনা করিতে হইবে, তখন সেই বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। গাঢ় মনঃসংযোগের জন্য সেই বিষয়ে মনের আসক্তির প্রয়োজন।

আসক্তি।—যেমন অপচয় নিবারণ জন্য মনঃসংযোগ আবশ্যক—মনের চপলগতি নিবারণ আবশ্যক—স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত করা আবশ্যক,—সেইরূপ যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে—যাহা শিক্ষা করিতে হইবে—সে বিষয়ে মানসিক আসক্তির প্রয়োজন। যে বিষয়ে তোমার বদ্ধমূল ঘৃণা বা বিরক্তি আছে সে বিষয়ে গভীর মনঃসংযোগ হওয়া কঠিন, এবং সে বিষয়ে সময় ব্যয় বিশেষ ফলোপধায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে বিষয়ে সময় ব্যয় করিতে হইবে, মনঃসংযোগ করিতে হইবে, পূর্ব্বে সেই বিষয় সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সে বিষয়টী কি—তৎসম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান কিছু আছে কি না—তাহা কর্ত্তব্য কি না—তাহাতে উপকার বা অপকারের অধিকতর সম্ভাবনা—তাহা তোমার মনের উপযোগী কি না—তোমার উপায় ও সময় সে বিষয়ের উপযুক্ত কি না—প্রথমে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, যদি তুমি মনে কর যে সে বিষয়টী অনুশীলনের উপযুক্ত, তবে দৃঢ়তার সহিত একাগ্রভাবে তাহাতে মন নিয়োজিত করিবে; এবং যতক্ষণ তাহা সম্পন্ন করিতে না পার, উদ্যমের

সহিত পরিশ্রম করিবে। যদি প্রথমে আসক্তি না থাকে, তবে ক্রমে তাহা উৎপন্ন হইবে।

আসক্তি স্থাপনের প্রধান উপায় এই :—যে বিষয়ে আসক্তি স্থাপন আবশ্যক, প্রথমতঃ সেই বিষয়ের আবশ্যকতা ও উপকারিতা উপলব্ধি কর এবং তৎপরে যথাসাধ্য তাহার কঠোরতা দূর কর। অজ্ঞানতা বশতই কঠোরতা অনুভূত হয়।

প্রাথমিক জ্ঞানের সম্পূর্ণতা।—উপস্থিত বিষয়ে প্রথমে যে জ্ঞান লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে ক্রমোন্নতি সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে। যাহাতে সেই প্রাথমিক জ্ঞান সম্পূর্ণ ও ভ্রমশূন্য হয় তাহার চেষ্টা করিবে; এবং সেই জ্ঞান মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবার জন্য, চিন্তা দ্বারা, তাহার অনুকূল নানা দৃষ্টান্ত উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবে। প্রাথমিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ হইলে, অতঃপর যাহা শিক্ষা করিবে, তাহাও অসম্পূর্ণ হইবে এবং কষ্টলব্ধ হইবে,—মনে সে জ্ঞানের সংস্কার কখনই বদ্ধমূল হইবে না, অচিরাৎ অপনীত হইবে এবং সম্যক্‌রূপে উন্নতিলাভ অসম্ভব হইবে। প্রাথমিক জ্ঞান, ভবিষ্যত জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তি যদি অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার উপরে নির্ম্মিত গৃহের পতনাশঙ্কা সর্ব্বদা। প্রাথমিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা

বশতই অনেকের পক্ষে শিক্ষা লাভের পরিশ্রম আশানুরূপ ফল উৎপাদন করে না। প্রথমে, রাশি ও যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ উত্তমরূপে শিক্ষা না করিয়া, ত্রৈরাশিক শিক্ষার চেষ্টা বৃথা ও কষ্টকর। জ্যামিতিতেও ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতকগুলি মূলসূত্রের উপর এই বিদ্যা গঠিত। সেই সূত্রগুলি প্রথমতঃ সম্পূর্ণ ও ভ্রমশূন্যরূপে শিক্ষা ও উপলব্ধি না করিলে প্রতিপাদ্য শিক্ষা করা দুষ্কর। তাহা না করাতেই কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে জ্যামিতি শিক্ষা ক্লেশকর হইয়া উঠে। সূত্রগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া শিক্ষা করিলে, জ্যামিতি শিক্ষা বিষয়ে আর কঠিনতা থাকে না। অপরাপর বিষয়ক জ্ঞান লাভ সম্বন্ধেও এইরূপ।

যখন যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত কখন কোন বিষয়ে অগ্রে পাদ-বিক্ষেপ করিবে না। যাহা শিখিবে—যতটুকু শিখিবে—তাহা উত্তমরূপে, ভ্রম-শূন্যরূপে শিখিবে এবং তাহা যথেচ্ছা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে। যে জ্ঞান লাভ করিতেছ, তাহা যথেচ্ছা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছ, ইহা অনুভব করা অত্যন্ত সুখকর। ইহাতে আসক্তি ও

জ্ঞান-লালসা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উন্নতি লাভ সহজ হইয়া পড়ে। তোমাকে জ্ঞানপথে ধীরগামী হইতে হয় হউক—বরং তাহা প্রার্থনীয়; কিন্তু যখন অগ্রসর হইবে, তখন পূর্ব্বলব্ধজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া দৃঢ়ভাবে পাদবিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলে আর কিছুতেই তোমার গতিরোধ করিতে পারিবে না। যখন যাহা শিখিতেছ তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে তোমার মনের সম্পত্তিস্বরূপ হয়, তবে উন্নতি নিশ্চয়ই তোমার করতলস্থ হইবে এবং প্রভূত মানসিক অপচয় নিবারিত হইবে।

মনের স্বাভাবিক গতি ও কার্য্যনির্ব্বাচন।—সংসারে আমাদের উন্নতি সাধনের উপযোগী শত শত কার্য্য আছে, জ্ঞানের শত শত বিভাগ আছে,—তুমি কোন্ বিষয়ের অনুসরণ করিবে? কার্য্যনির্ব্বাচন মনের কার্য্য, কিন্তু ইহা অতি গুরুতর বিষয়। তোমার অনেক শুভাশুভ, জীবনের অনেক অপচয় বা সদ্ব্যয়, ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি আপনার উপযুক্ত কার্য্য বাছিয়া লইতে পার এবং অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই কৃত-কার্য্য হইবে। কার্য্য নির্ব্বাচনের সাধারণ নিয়ম এই:—যে বিষয়ে তোমার মনের স্বাভাবিক গতি সেই দিকে মন চালিত কর, পরিশ্রম কর,—উন্নতি

হইবে। যে দিকে মনের স্বাভাবিক গতি, মন যদি সেই দিকে বিচরণ করিতে পায়, তবে আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও আসক্তির সহিত ক্রিয়াবান হয়—শিক্ষা লাভ শীঘ্র শীঘ্র হয়—পরিশ্রম বিশেষ ক্লেশকর হয় না—সুতরাং অপেক্ষাকৃত সহজে কার্য্য সম্পাদিত হয়। কোন বিশেষ বিষয়ের দিকে মন কেন ধাবিত হয় ইহা স্থির করা অতি জটিল ও গুরুতর বিষয়। সংস্কার, শিক্ষা, পৈতৃক মানসিক গুণ, সামাজিক অবস্থা, চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলী, ইত্যাদির উপর তাহা বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করে। সে যাহা হউক, যদি মনের গতি বুঝিয়া কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে পার এবং প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে পার, তবে উন্নতিকে নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে—জীবনের প্রভূত অপচয় নিবারণ করিতে পারিবে—সিদ্ধ-মনোরথ হইবে—সুখী হইবে। জগতের ইতিহাসে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সার আইজাক নিউটনের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার অসাধারণ মনঃসংযোগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মার্জ্জার শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র কলেবরে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেই নির্জ্জীব-প্রায় শিশুর অভ্যন্তরে যে মহীয়সী শক্তি নিহিত

ছিল—যে শক্তি বিকাশমান হইয়া বিজ্ঞানক্ষেত্র সুশোভিত ও আলোকিত করিয়াছিল—তখন তাহা কাহারও গোচর ছিল না। নিউটনের পিতা কৃষক ছিলেন। জন্মের অল্পদিন পরেই পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, নিউটনের সমস্ত ভার তাঁহার জননীর উপরে পতিত হইল। কিন্তু জননী পুনরায় বিবাহ করিলেন। নিউটন শিক্ষালাভার্থে, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, প্রথমতঃ গ্রান্থাম নামক স্থানের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। সেইখানেই তাঁহার গণিত বিষয়ক আসক্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকৌশল দ্বারা—এক প্রকার সামান্য বায়ু-পরিমাপক যন্ত্র, জলঘড়ী, ইত্যাদি নির্ম্মাণ দ্বারা—অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি ছিল। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, জননীর আদেশে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিউটন গৃহে আসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন কি কৃষিকার্য্যে নিরত থাকিতে পারে? তিনি সে কার্য্যে সম্পূর্ণ অনাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা (অনেক সময়ে গোপন-ভাবে) পুস্তক পাঠে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি গ্রান্থামের হাটে প্রেরিত হইলেন। যাইতে যাইতে রাস্তার ধারে, একটী তৃণরাশি সন্নি-

ধানে, গণিত বিষয়ক প্রতিপাদ্য প্রমাণে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য, পাদ্‌রী নিউটন, দৈবক্রমে এই অসাধারণ ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বালক নিউটনের মনের গতি অনুযায়ী শিক্ষাদান জন্য তাঁহার জননীকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই সৎ-পরামর্শ অনুসারে নিউটন কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। যদি পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নিউটনকে সময়াতিপাত করিতে হইত, তবে, সম্ভবতঃ আমরা তাঁহার নামও জ্ঞাত হইতাম না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুণবান অধ্যাপক দিগের সহায়তায়, দিন দিন তাঁহার শিক্ষা লাভের উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি, মনের গতি অনুসারে, বিজ্ঞান চর্চ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার ফল আশাতীত এবং মানব সমাজের পরম মঙ্গলজনক হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত প্রিন্সিপিয়া নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তিনি দর্শাইয়াছেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানে কিছুই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না যাহা দর্শনজনিত জ্ঞান (experience) এবং পর্য্য-বেক্ষণ (observation) দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে না পারে। একদিন, বৃক্ষ হইতে একটী আতা

ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া নিউটনের মনে হইল, আতাটী ঊর্দ্ধগামী না হইয়া কি কারণে ভূতলে পতিত হইল ? কিছুকাল যাবৎ এইবিষয়ে পুনঃ পুনঃ গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন যে, যে শক্তিবলে আতা ভূতলে পড়িল সেই শক্তিবলেই গ্রহগণ গগণমণ্ডলে সংস্থিত ও ভ্রাম্যমাণ। সেই শক্তি বলেই বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। সেই শক্তির নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আলোক ও রঙ্গের প্রকৃতি নিরূপণ করেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে যথার্থ জ্ঞানীর লক্ষণ অপূর্ব্বভাবে বিকাশিত ছিল। তিনি সরল-হৃদয়, দয়ালু, বিনয়ী, এবং অহঙ্কার ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য ছিলেন এবং আজীবন বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে বিশ্বপতির মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।

আমাদের স্বদেশবাসী কেশব চন্দ্র সেন আজীবন মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারে কার্য্য করিয়া কিরূপ উন্নত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা কে না অবগত আছেন ? তিনি কলিকাতা কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেনবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যদিও সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ, তিনি হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপন করিতে সমর্থ হন নাই। প্রবল জ্ঞান-লালসা বশতঃ তিনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও জ্ঞানানুশীলনে

বিরত হইলেন না। কেহই তাঁহার পথদর্শক ছিলেন না—কোন্ বিষয়ক জ্ঞান চর্চ্চায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, তাহা কেহই বলিয়া দেন নাই। সুতরাং যে দিকে মনের স্বাভাবিক গতি সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব অপূর্ব্বভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি অল্পকাল কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। * তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় রামকমল সেনের সময় হইতে ব্যাঙ্কে সেনবংশীয়-দিগের প্রতিপত্তি চলিয়া আসিতেছিল। তিনি কিছুদিন পরে ব্যাঙ্কে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী মন কি ব্যাঙ্কগৃহে (অর্থপূর্ণ হইলেও) আবদ্ধ বা তৃপ্ত থাকিতে পারে? তিনি মনের গতি অনুভব করিয়া পদোন্নতির প্রাক্কালেই সে কার্য্য পরিত্যাগ করি-লেন এবং স্বদেশের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনী ও ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস সম্মিলিত হইল,—তাঁহার মনের অপূর্ব্ব বিকাশ আরম্ভ হইল *। ইংরাজী ভাষায়,

---

* এই সময়ে আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধে অতি অল্পকাল যাবৎ তিনি টাকশালের দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন।

মনোবিজ্ঞানে, তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল— তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অদ্ভুত ছিল—তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ইংরাজগণও মোহিত ও বিস্মিত হইতেন— তিনি গবর্ণর-জেনেরলের নিকট,ভারতেশ্বরীর নিকট, বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন—ইহা বলিলে তাঁহার বিষয় কিছুই বলা হইল না। তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল অতি সামান্য বিষয়। দৈব প্রতিভা তাঁহাকে যে উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা সম্রাটগণের পক্ষেও লভনীয় নহে। তিনি ধর্ম্ম-জ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞান প্রচারে ও সমাজ সংস্করণে যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক বিচা-রের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখক শ্লাঘাপূর্ণ-হৃদয়ে সবিস্তারে তাহা বর্ণন করিবেন সন্দেহ নাই। যে সময় ইংরাজী-শিক্ষাপ্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মমত বিচলিত হইয়াছিল—যে সময় শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে বিশে-ষতঃ বৃহৎ নগরে, হিতবাদ (materialism) সংশয়বাদ (scepticism) এবং অনেক পরিমাণে যথেচ্ছাচার প্রবল হইতেছিল; সেই সময়ে তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা ও গভীর চিন্তাপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সহস্র সহস্র যুবক ন্যায় ও ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হইয়াছেন—তাঁহার রোপিত বীজ অলক্ষিতভাবে

সহস্র সহস্র লোকের মনে অঙ্কুরিত হইয়া আশাতীত ফল প্রসব করিয়াছে। যেখানে কেবল শুষ্ক তর্ক ও শুষ্ক যুক্তির ক্রিয়া ছিল—যেখানে কেবল শব্দ-পারিপাট্যের প্রবলতা ছিল—তাঁহার গভীর হৃদয়-নিঃসৃত, প্রেমপূর্ণ উপদেশে, সেখানে ভক্তিধারা প্রবাহিত হইয়াছে। পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মের সার একীভূত করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্যম। তাঁহার মহীয়সী প্রতিভা ভারতে প্রদীপ্ত হইয়া দূরবর্ত্তী ইউরোপেও অলোক বিস্তার করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত উপন্যাসলেখক এবং সুবিখ্যাত রাজনৈতিক বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি (লর্ড বিকন্‌স্‌ফীল্‌ড) প্রথমতঃ, ব্যবহারাজীব হইবার উদ্দেশে কোন আটর্ণির কার্য্যালয়ে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই মনের গতি অনুভব করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সাহিত্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রই তাঁহার ভাবী রঙ্গভূমি হইবে। একদা রাজমন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোর্‌ণের প্রশ্নোত্তরে ডিস্‌রেলি গভীরভাবে বলিয়াছিলেন—"আমি ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি।" এই গর্ব্বিত উত্তর যে কেবল লর্ড মেল্‌বোর্‌ণকে

অসন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না; ইহাতে তাঁহার মনের আভ্যন্তরিক কামনাও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মনের গতি অনুসারে ও অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইয়া, কেবল যে প্রধান রাজমন্ত্রীর পদ সুশোভিত করিয়াছিলেন এমন নহে, নানা গ্রন্থ প্রণয়নে সাহিত্য জগতেও বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বেঞ্জামিন টমসন (কাউণ্ট রমফোর্ড) আমেরিকাদেশীয় একজন কৃষকের পুত্র। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্যবসায় শিক্ষা জন্য এক বণিকের কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বণিকের বিপণি তাঁহার প্রতিভাবিকাশের স্থান ছিল না—তাঁহার মনের গতি বিজ্ঞানের দিকে ছিল। কার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় বণিক তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। টমসন চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে একটী বিদ্যালয় খুলিয়া কোন মতে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক ধনশালিনী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি ইচ্ছানুরূপ বিজ্ঞানালোচনে সমর্থ হইলেন। তিনি ইউরোপে গরীবদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে অশেষ যত্ন ও নানা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। যিনি মহাজনের কার্য্যালয় হইতে বিদূরিত হইয়াছিলেন, তিনি, মনের গতি অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া, এক্ষণে "উত্তাপ ও গতির একত্ব" প্রতিপাদনে বিজ্ঞান জগৎ বিমোহিত করিলেন! তাঁহারই যত্নে, ইংলণ্ডদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা জন্য, রয়েল ইনষ্টিটিউট নামক সমাজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রগাঢ় যত্নে বেভেরিয়া দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করেন।

মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারে, অধ্যবসায় সহকারে, ন্যায়জ্ঞান সহায়ে কার্য্য করিলে কিরূপে মানুষে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, আমাদের স্বদেশীয় বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পালের জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি উচ্চবংশে বা শ্রেষ্ঠবর্ণে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা অতি মন্দ ছিল। সুতরাং যে সকল কারণে সহজে হিন্দুসমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠতা বা প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তাহা বিদ্যমান ছিল না। তিনি প্রতিকূল অবস্থা-আচ্ছাদিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইত না। এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু মিট্রোপলিটান কলেজ নামক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে কলিকাতায় শিক্ষিত যুবকদিগের লিটারেরি ফ্রী ডিবেটিং ক্লব নামক একটি সভা ছিল। সেখানে নানা বিষয়ক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। কৃষ্ণদাস তাহাতে যোগ দিলেন। এই খানে তাঁহার তর্কশক্তি ও বাগ্মিতার বিকাশ আরম্ভ হইল। কলেজে অধ্যয়ন কালেই সংবাদ পত্রের দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তিনি ইংরাজী নানা সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের পর তিনি অধিকতর মনোযোগের সহিত এই কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্দারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের আনুকূল্য হইত না। কিছু উপার্জ্জন না করিলে সংসার চলে না। এই সময় তিনি চব্বিশ পরগণার জজ আদালতের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। দুরবস্থা-পীড়িত হইলেও তাঁহার স্বাধীন মন কয় দিন কেরাণীর কার্য্যে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে? যে দিকে মনের

পাত্তি, শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি সেই দিকে অগ্র-সর হইতে লাগিলেন এবং কয়েক মাস পরে ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

একক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক রাজনৈতিক সমাজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হইল। একজন দয়াবান বন্ধুর সহায়তায় তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার রাজ-নৈতিক প্রতিভা বিকাশের এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত হইল। এই সমাজে কলিকাতার শিক্ষিত ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে অতি প্রশংসনীয়-রূপে এসোসিয়েসনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সভায় সর্ব্বদাই নানা রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলন হইয়া থাকে, এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমাজে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হয়, উক্ত এসোসিয়েসন তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত সমাজাগ্রগণ্য ব্যক্তি-গণের সহিত ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করায়, ক্রমে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক জ্ঞান গভীরতর হইতে লাগিল। তিনি ঐ সমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমে তাহার জীবন স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট নামক সংবাদ পত্রের জন্মদাতা, দেশহিতৈষী, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে, ঐ সংবাদ পত্র কৃষ্ণদাসের হস্তে অর্পিত হইল,—তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইল। তাঁহার প্রতিভাবলে হিন্দুপেট্রিয়ট অগ্রগণ্য সংবাদ পত্র এবং দেশের মধ্যে একটী প্রবল শক্তি স্বরূপ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও অবশেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমাজ মধ্যে, বিশেষতঃ জমীদার ও শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে, তাঁহার প্রতিপত্তি প্রবলভাবে ব্যাপ্ত হইল। ইহা সাধারণ প্রশংসার বিষয় নহে যে, তিনি কখন সে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদন করেন। এই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবনী অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত।

তিনি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যে—মিউনিসিপাল কমিশনারের কার্য্যে—ব্যবস্থাপকের কার্য্যে—রাজনৈতিক আন্দোলনে—হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদনে—যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—দেশের হিত সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন,—অল্প লোকেই

সেরূপ হইয়া থাকে। যিনি সাংসারিক দুরবস্থা-পূর্ণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ক্লেশে বিদ্যা-র্জন করিয়াছিলেন—অতি সামান্য খাপরা-আচ্ছা-দিত গৃহে, দীন ভাবে মাদুরে বসিয়া, প্রথমে সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহার বাটীর সম্মুখে বড়লোকদিগের গাড়ীর স্থান-সমাবেশ হইত না। যিনি অভাবপীড়িত হইয়া ২৪ পরগণার জজ আদালতের অনুবাদকের পদ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন—তিনিই অবশেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমাজ সমুজ্জ্বল করিলেন। ইহাই মনোবলের খেলা! কোথায় প্রতিকূল ঘটনাবলী?—কোথায় দুরবস্থা?—কোথায় জাতীয় অবরোধ?—প্রবল মানসিক শক্তি এ সমস্ত অবরোধ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল।

কৃষ্ণদাস সচ্চরিত্র ও সহৃদয় মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা সকল শ্রেণীর লোকের মন আকর্ষণ করিত। তাঁহার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি অসাধারণ ছিল এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার অনুভবশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। কোন বিষয় উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা, সম্ভাবনীয়তা বা অসম্ভাবনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং প্রবল যুক্তিবলে নিজ মত

সমর্থন করিতে পারিতেন। কোন্ সময়ে কোন্ কথা বলিলে উপকার হইবে, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। তাঁহার স্থিরচিত্ততা অনুকরণীয় ছিল। এই কারণ বশতই প্রায় সর্ব্বদাই, তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি প্রবল ও অকাট্য হইত। তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের বা রাজকর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই লেখনী চালনা করিতে হইত,—অনেক সময় অন্যায় কার্য্যের বা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে হইত। এ সকল ঘটনায় স্বভাবতঃই মনে ক্রোধ বা চঞ্চলতা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তির ক্রিয়া সেরূপ মানসিক অবস্থায় সুচারুরূপে হইতে পারে না। সে সময়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা যায়, তাহা রুক্ষ ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস স্থিরচিত্ততা প্রভাবে কখন মানসিক তুলবিহীন হইতেন না— কটু বা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তিনি জানিতেন, তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারের অধিক সম্ভাবনা। কৃষ্ণদাসের এক প্রবল ক্ষমতা এই ছিল যে, তিনি অপ্রিয় সত্য এরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে, কোন বিবেচক লোক তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না।

যদিও অতি সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—বঙ্গীয় সমাজের রাজনৈতিক

নেতা হইয়াছিলেন—দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের পথ-দর্শক হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বকালের ঋজু ও শান্ত স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই—সনাতন হিন্দুধর্ম্মোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় নাই—অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তাঁহার গৃহে আগত দীন দুঃখীদিগের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন এবং যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ মোচনে যত্ন করিতেন। ক্রমাগত গুরুতর মানসিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনেও ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বিদ্যালয়ে ভাল-রূপে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। পাঠ্যা-বস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। সেই অবধি সংসারের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র উচ্চতম আদালতে কর্ম্ম করিতেন। তিনি অক্ষয় কুমারকে আইন অধ্যয়নের পরামর্শ দেন, কিন্তু মনের গতি অনুভব করিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। মনের গতি অনুযায়ী জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা কে না জ্ঞাত আছেন? তিনি বহু আয়াসে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় তাহা

সাধারণের অনায়াস-লব্ধ করিতে যত্ন করিত। তাঁহার তেজস্বিনী লেখনীপ্রসূত 'চারুপাঠ', 'ধর্ম্মনীতি', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এবং 'পদার্থবিদ্যা' দ্বারা বঙ্গদেশের অসীম উপকার সাধিত হইয়াছে। 'উপাসক সম্প্রদায়' বঙ্গভাষার এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বঙ্গভাষার গঠন বিষয়ে তাঁহার সহকারিতা অতি মূল্যবান। কেবল ইহাই নহে, বঙ্গভাষায় মনোবিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার প্রথম প্রবর্ত্তক অক্ষয়কুমার। বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

যে বিষয়ে মন যায় না সে বিষয়ে মনঃসংযোগ করা ও পরিশ্রম করা যে কিরূপ ক্লেশকর কার্য্য, তাহা কে না অবগত আছেন? এই কারণে কত সময় বৃথা নষ্ট হয়—কর্ত্তব্য পালনের কত ব্যাঘাত হয়—কত লোকের মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। কিন্তু, অনেক সময়ে, কোন্ দিকে মনের স্বাভাবিক গতি তাহা স্থির করা সহজ বিষয় নহে। বিশেষতঃ যে সকল মনে কোন বিশেষ বিষয়ক স্বাভাবিক অনুরাগ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নহে, সে সকল মনের স্বাভাবিক গতি নিরূপিত করা সহজ কথা নহে। হয়ত তুমি যে দিকে মনের

স্বাভাবিক গতি স্থির করিতেছ সে দিকে স্বাভাবিক গতি নহে, কল্পনাবশতঃ তোমার ভ্রম হইতেছে; কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলে মনের প্রকৃত গতি অন্যদিকে। সুতরাং মনের প্রকৃত গতি স্থির করিবার জন্য, অনেক সময়ে, যত্নপূর্ব্বক মন পরীক্ষা করা আবশ্যক। হয়ত, যিনি এক কার্য্য অনুরাগ অভাবে অতি কষ্টে করিতেছেন—কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন—তিনি অন্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সুখী ও উন্নত হইতে পারেন। যখনই বুঝিবে যে মনের গতি অনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার নাই, যদি তোমার অবস্থা অনুকূল হয়, অচিরাৎ ভ্রম সংশোধন করিবে—মনের উপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক ডেভিড হিউম, আইন শিক্ষা করিবেন প্রথমতঃ ইহাই স্থির হইয়াছিল। এ বিষয়ে আসক্তি না থাকায়, ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে ব্রিষ্টল নগরে এক সমৃদ্ধিশালী মহাজনের কার্য্যালয়ে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইলেন। মনের অনুযায়ী না হওয়ায়, ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন—উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া এইবার তাঁহার প্রতিভা জাগরিত হইল।

ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, স্বদেশের অগ্রগণ্য মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ফ্রান্সদেশীয় বিখ্যাত রাজনৈতিক ও ইতিহাসবেত্তা থিয়ার্স, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সৈনিকদলে প্রবেশ করিবেন, প্রথমে ইহাই স্থির হইয়াছিল। দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনে, সে ব্যবসায়ে অসহায় যুবকের বিশেষ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা না থাকায়, ব্যবস্থা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সাহিত্য ও রাজনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া এইবার তাহার মানসিক শক্তি মুকুলিত ও ফলবতী হইতে আরম্ভ হইল। তিনি ফরাসীবিপ্লবের উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিলেন—রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মন আকর্ষণ করিলেন—রাজমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় সমরের পর প্রজাতন্ত্র-ফ্রান্সের উচ্চতম পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে অনেকের পক্ষে মনের গতি অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাতে প্রবৃত্ত

হওয়া কঠিন। দেশের অবস্থা—সমাজের অবস্থা—শিক্ষার অবস্থা—তাহার অনুকূল নহে। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাপ চিরদিনই নিষ্ফল। চেষ্টাদ্বারা প্রতিকূল অবস্থা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়াই উন্নতিকাম পুরুষের মূলমন্ত্র। তুমি যে অবস্থায় স্থাপিত, সেই অবস্থা হইতেই তোমাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষা করিবার সময় নাই। তাহা কত দিনে আসিবে—আসিবে কি না আসিবে—তাহা কে বলিতে পারে? চেষ্টাদ্বারা, মনোবল দ্বারা, প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করিয়া লইতে হইবে।

জ্ঞানসম্বন্ধে তোমার জন্য শত শত দ্বার মুক্ত আছে। যদি তোমার মনের দৃঢ়তা থাকে, চেষ্টা থাকে, তবে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান আজীবন বৃদ্ধি করিতে পার—মনের গতি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিতে পার—আপনার ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পার। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, তোমার জন্য কত উর্ব্বরা ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে, তুমি চেষ্টা করিলে তাহা ফল ফুলে সুশোভিত করিতে পার।

আলস্য—প্রতিক্রিয়া।—প্রকৃত পরিস্থাপের বিষয় এই যে তুমি সংসারে প্রবিষ্ট হইলে, উপার্জ্জন

করিতে শিখিলেই, তোমার জ্ঞানচর্চ্চা, মানসিক উন্নতিচেষ্টা প্রায় শেষ হইল। হয়ত তোমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু বৃথা গতিক্রিয়ায়—আজ করি কাল করি, করিয়া—সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না,—বৃথা গল্পের সহিত, বৃথা আমোদ প্রমোদে অমূল্য জীবন বহিয়া যাইতেছে। হয়ত, তুমি শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করিতেছ যাহা কখন আসিবে না,—হয়ত, দুরবস্থার ভ্রূকুটি দেখিয়াই, বা দু একটি প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইবা মাত্র, তোমার জ্ঞান-চর্চ্চা শেষ হইতেছে—জীবন বৃথা হইতেছে। এরূপে জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

অধ্যবসায়।—যদি তুমি জীবনঅপচয় নিবারণ করিতে চাও—কর্ত্তব্য পালন করিতে চাও—উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাও,—তবে আলস্য, গতিক্রিয়া পরিহার কর—যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ তাহা অচিরাৎ করিতে যত্নবান হও। স্থির-চিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ক্লেশসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী না হইলে কেহই উন্নতির পথে দূরগামী হইতে পারে না। অবিচলিত চিত্তে, প্রবল চেষ্টা বলে, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে না পারিলে, জগতে কে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে? যদি প্রত্যেক প্রতিকূল বায়ু দ্বারা তোমার মন পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তুমি কিছুই

করিতে পারিবে না। কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নিরূপিত করিবে—তাহা তোমার উপযোগী কি না পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিবে। কিন্তু যখন তাহাতে একবার প্রবৃত্ত হইবে, তখন মনের সমস্ত বেগ, সমস্ত শক্তি তাহাতে নিয়োজিত করিয়া আনন্দ মনে দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করিবে,—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমাগত, একাগ্র, অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিবে। যতক্ষণ সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পার ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই বর্জ্জন করিবে না। যতই বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক, কিছুতেই সাহসহীন হইবে না—ক্রমাগত প্রবল পরাক্রমে অগ্রসর হইবে—কার্য্যক্ষেত্রে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" তোমার পণ হইবে। যদি ভ্রমক্রমে এমন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া থাক, যাহা সুসম্পন্ন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নহে, অচিরাৎ তাহা বর্জ্জন করিবে।

অনেক সময় দুরবস্থা ও অন্যান্য শত শত প্রতিকূল ঘটনা শত্রুভাবে তোমার উন্নতির পথে দণ্ডায়-মান হইবে—তোমাকে ভীষণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—গুরুতর আঘাত সহ্য করিতে হইবে। যাতনা যতই প্রবল হইবে, ততই প্রবলতর বেগে যুদ্ধ করিবে।

যদি এই যুদ্ধে জীবন শেষ হয় হউক, তাহা গৌরবের বিষয়; কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় কদাচ বিমুখ হইবে না। একবার পরাজয়েই যদি তুমি নিবৃত্ত হও—নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট হও—তবে তোমার পক্ষে সর্ব্বত্রেই পরাজয় সহজ হইয়া পড়িবে—তোমার চরিত্র ক্ষীণবল হইয়া যাইবে। একবার চেষ্টা বিফল হইল, পুনরায় চেষ্টা কর,—দ্বিতীয় চেষ্টা বিফল হইল, পুনরায় চেষ্টা কর,—তৃতীয় চেষ্টা বিফল হইল, পুনরায় চেষ্টা কর,—ক্রমাগত চেষ্টা কর—পরাজয়কে পরাজিত কর। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব—ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—ইহাই উন্নতি লাভের উপায়। যদি এইরূপে কার্য্য করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই সিদ্ধমনোরথ হইবে। যদি অবস্থা অনুকূল হয়—বাধা বিঘ্ন না থাকে—তবে অল্প আয়াসে উন্নতি লাভ করিতে পার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে জয়-ভেরীর মধুর নিনাদ নাই—সজীবতা নাই। যিনি শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, দুরবস্থার প্রতিকূলতা পদ-দলিত করিয়া, বীরভাবে জ্ঞান-পথে অগ্রসর হন—শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন—গৌরবের উজ্জ্বল মণি তাঁহারই উন্নত শির সুশোভিত করে।

প্রতিকূল ঘটনাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া—দুরবস্থা-পীড়িত হইয়া—জ্ঞানানুশীলনে, কর্ত্তব্য-

পালনে, বাধ্য হইতেছ বলিয়া বিষাদিত বা ভগ্নোৎসাহ হইও না,—তাহা চিরস্থায়ী নহে। গভীর মনোবলের সহিত অবিরাম আঘাতে শত্রুগণকে ধরাশায়ী কর এবং এইরূপে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকার লাভ কর—চরিত্রের দৃঢ়তা সাধন কর—জগতে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত হও। মনে করিও না যে দুরবস্থা কেবল ক্লেশ ও দুর্ভাগ্যময়। অনেক সময়ে দুরবস্থা বন্ধুভাবে আগমন করে—সাংসারিক জ্ঞানের প্রসূতি স্বরূপ হয়—চরিত্রের সবলতা সাধন করে—মনের অস্ফুট শক্তি সকল জাগরিত করে—এবং মনের সম্পূর্ণ বিকাশের সহায় হয়। প্রাথমিক ভ্রমণ চেষ্টায় শিশু যেমন পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতিত হইয়া শরীরভারের তুল-রক্ষা শিক্ষা করে, এবং ক্রমে উত্তমরূপে ভ্রমণ করিতে পারে, সেইরূপ আমরা প্রতিকূল-ঘটনাবলী-সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া অবস্থা ও মনের তুল-রক্ষা শিক্ষা করি, এবং তদ্দ্বারা আমাদের চরিত্র দৃঢ় ও সবল হয়।

বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলির (লর্ড বিকন্‌স্‌ফীল্‌ডের) চরিত্রে অধ্যবসায়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পিতামহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিনিস হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং বাণিজ্য দ্বারা সৌভাগ্যশালী হন। বেঞ্জামিনের

পিতা আইজাক, বাণিজ্য-অনুরাগ অভাবে সাহিত্যের অনুসরণে জীবনাতিপাত করেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। বালক বেঞ্জামিনের জ্ঞানপ্রভা দেখিয়া অনুভূত হইত যে, তিনি ভবিষ্যতে সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন। কিন্তু ব্যবস্থা-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কোন আটর্ণির কার্য্যালয়ে নিযুক্ত করা হইল। তিনি কার্য্য শিখিতে লাগিলেন। সে স্থান তাঁহার প্রতিভা বিকাশের উপযোগী ছিল না। তিনি সাহিত্যের অনুসরণ ছাড়িলেন না। ক্রমে তাঁহার প্রণীত সুন্দর গ্রন্থ এক এক খানি করিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল— তিনি খ্যাতনামা হইলেন। প্রগাঢ় আসক্তি বশতঃ প্রবল সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যেও, সর্ব্বদা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাঁহার প্রবেশচেষ্টা শিক্ষণীয় বিষয়। এই চেষ্টায় তিনি ক্রমে তিনবার বিফলমনোরথ হইলেন,—কিন্তু পরাজয় তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি চতুর্থবার কৃতকার্য্য হইলেন! তিনি মহাসভায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে যে বক্তৃতা করিলেন তাহা জঘন্য হইল—চারিদিকে লোক হাসিতে লাগিল— তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তিনি বক্তৃতা সমাপন পূর্ব্বেই বসিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই

কথাগুলি বলিয়া বসিলেন :—"আমি অনেকবার অনেক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি ও অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছি; আমি এখন বসিতেছি, কিন্তু সেই সময় আসিবে যখন তোমরা আমার বক্তৃতা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে।" সেই সময় আসিয়াছিল। ক্রমে তিনি অতি প্রবল ও প্রসিদ্ধ বক্তা হইয়া উঠিলেন। লোকে ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে থাগিল—তাঁহার ব্যঙ্গোক্তির তীক্ষ্ণ শরে প্রতিপক্ষগণকে জর্জ্জরিত হইতে হইল। ইহাই অধ্যবসায়—ইহাই পুরুষকার! তিনি মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিলেন এবং অবশেষে ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়া লর্ড বিকনস্‌ফীল্‌ড উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

গ্রীস দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ডিমস্‌থিনিস্‌, সাধারণে প্রথম বক্তৃতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার শ্বাসযন্ত্র অতি দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং স্বর গভীর ছিল না। তাঁহার উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল এবং অঙ্গভঙ্গি কদাকার ছিল। এত স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তিনি নিরুত্তম হইলেন না। কিছুদিন একান্তে, প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে, স্বাভাবিক বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উচ্চারণ স্পষ্ট করিবার জন্য মুখমধ্যে প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া বলিতে

আরম্ভ করিলেন—উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ কালে, কখন গর্জ্জিত সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান হইয়া একান্তে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন—অঙ্গভঙ্গি মনোহর করিবার উদ্দেশে মুকুরের সম্মুখে বলিতে লাগিলেন—বাহু উৎক্ষেপের কদর্য্য অভ্যাস নিবারণ জন্য যেখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন, সেই স্থানে আপনার বাহুর উপর তরবারি লম্বমান করিয়া রাখিতেন। প্রবল অধ্যবসায় বলে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক দূর হইল—ডিমস্থিনিস্ প্রাচীন কালের সর্ব্বাগ্রগণ্য বক্তা হইয়া উঠিলেন।

স্কটলণ্ড দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ টমাস এড্‌ওয়ার্ড অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি কোন পাদুকা-কারের দোকানে পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতেন। প্রতিভাশালী বা প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি না হইলেও তাঁহার জ্ঞানলালসা অতি প্রবল এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত ছিল। জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে প্রাতঃকাল হইতে রজনী নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পাদুকা নির্ম্মাণ করিতে হইত। সুতরাং রজনীতেই তাঁহাকে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইত। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর কয় ব্যক্তি এরূপ করিতে সমর্থ হয়? তিনি একাকী একটী পুরাতন ভগ্ন বন্দুক লইয়া, পশু পক্ষ্যাদি আহরণ

জন্য রজনীযোগে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। প্রবল মানসিক শক্তিবলে এইরূপে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত বাধা, সমস্ত প্রতিকূলতা বিদূরিত করিলেন। তাঁহার চিরভিলষিত মৃতজীবজন্তুপূর্ণ চিত্রশালিকা স্থাপিত হইল—তিনি বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ধন্য অধ্যবসায়, ধন্য মনোবল! দুরবস্থাপীড়িত অসহায় পাতুকাকার এডওয়ার্ডের বীরত্বপ্রভায় যুদ্ধবিশারদ মহাবীর হানিবল, আলেকজণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতির গৌরবও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে রাজা রাম মোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহানুভবের বিচিত্র চরিত্র যখনই আলোচনা করা যায়, তখনই হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহার চরিত্রে যেরূপ নানা সদ্গুণ একাধারে সমন্বিত হইয়াছিল, তাহা কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সুগঠিত, তাঁহার মন ততোধিক শক্তি ও শোভা সম্পন্ন ছিল। সাহস, স্বাধীনচিত্ততা, মেধা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, জ্ঞানলালসা, উদ্যম, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, আত্মনির্ভর, আত্মশাসন, দয়া, দেশহিতৈষিতা, উদারতা, সার্ব্বভৌমিকতা, আত্ম-

পরতা—তুমি যে গুণ চাও, তাঁহার চরিত্রে তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিবে। তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। পিতার যত্নে রাম মোহন রায় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে পারস্য ভাষায় রাজ-কার্য্য পরিচালিত হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে পিতার সহিত মতভেদ হওয়ায়, ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইয়া, ভারতের নানা স্থান পরি-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে দুস্তর হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে উপনীত হই-লেন। কিছুদিন যাবৎ সেখানে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া, এবং স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া, পিতার আবাহনে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। দেশভ্রমণে ও বয়োবৃদ্ধি সহ-কারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীন মত প্রবলতর হইয়াছিল। পিতার সহিত দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব হইয়া উঠিল—পুনরায় গৃহবহিষ্কৃত হইলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গপুরে কালেক্টরীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বা ২৮ বৎসর। ২২ বর্ষ বয়ঃক্রমের পর ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কালে-

ক্টর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক্ষণে কালেক্টরের সহায়তায় ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ হইল। "ত্রয়োদশ বৎসর সরকারী কর্ম্ম করিয়া অবসৃত হইলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৪১ বর্ষ বয়ঃক্রমে, কলিকাতায় অবস্থান—করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, ঊনবিংশতি বর্ষ যাবৎ, তিনি কায়মনোবাক্যে স্বদেশের হিত-সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ের অবস্থা অন্য প্রকার ছিল। তখন (১৮১৪ খৃঃ অঃ) কালেজ ও স্কুল ছিল না; ইংরজী ভাষায় সুশিক্ষিত দেশীয় লোক, ইংরাজের রাজধানী কলিকাতাতেও প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র—সম্ভবতঃ দেশীয় ভাষায় দেশীয় লোক দ্বারা সম্পাদিত কোন সংবাদ পত্র এখনও প্রচারিত হয় নাই। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতের যে ব্যাপ্তি এখন দেখিতেছ, তখন তাহার কিছুই ছিল না। বঙ্গ ভাষার অবস্থা শোচনীয় ছিল। কয়েক খানি কাব্যগ্রন্থে, বঙ্গভাষা নিবদ্ধ ছিল; গদ্য রচনার প্রথা—গদ্যে পুস্তক লিখিবার প্রথা—প্রবর্ত্তিত হয় নাই। টোলে সংস্কৃত এবং পাঠশালে বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠশালে কোন পুস্তক

পুড়ান হইত না—হিসাব কিতাব, জমিদারী সেরিস্তার কার্য্য, পত্রাদি লিখন, পঠন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। চতুর্দ্দিক অজ্ঞানতমসে আচ্ছন্ন।

এরূপ সময়ে জ্ঞানসূর্য্যবৎ রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় প্রকাশিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই প্রশস্ত, এই মত সংস্থাপনে যত্নবান হইলেন। একাকী সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইল—হিন্দুসমাজ কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে তাঁহার মতের প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। তিনি প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া, মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে নানা পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রচার করিলেন,—প্রতিপক্ষগণও সেই উপায়ে পুস্তকাদি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনে গদ্য রচনার বহুলতা হইল—উভয় পক্ষ হইতে সংবাদ পত্র প্রচারিত হইল—সাধারণের মনে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চিন্তা উদ্রিক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে রামমোহন রায় কয়েকজন মাত্র শিষ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সেখানে সর্ব্বজাতীয় লোক একত্রে এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা

করিবে।* তিনি দর্শাইয়াছেন যে হিন্দু, মুসলমান, ও খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাই প্রশস্ত।

তিনি কেবল ধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন না। সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের প্রধান নেতা তিনি। দেশীয় বালকগণের ইংরাজী শিক্ষা জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগকে প্রাচীন প্রথানুসারে, দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করা হইবে, সে সময় রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই মত প্রবল হয়। তিনি সেই মত খণ্ডনে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মত গবর্ণমেণ্টে গ্রাহ্য হইয়াছিল। তিনি হিন্দু কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী। সতীদাহ নিবারণের মূলসূত্র তিনি। তাঁহাকে বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ গদ্য রচনার জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিই প্রথমে এ দেশে জুরি-বিচার প্রবর্ত্তনের জন্য যত্নবান হন। হিন্দুরমণীগণের দায়াধিকার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বহুবিবাহ-প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে যত্নবান হন। এক্ষণে বিলাত গমন সহজ ব্যাপার হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞানলাভ ও স্বদেশীয়

লোকের মঙ্গল কামনায় বিলাত গমন করেন, এবং সেই খানে ১৮৩৩ খৃঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, সকলই অসাধারণ ছিল। তিনি দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি দুরূহ বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দশটী ভাষায় সম্যক রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ সার উইলিয়ম হর্শেলের জীবনে অধ্যবসায়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পিতা বাদ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন; হর্শেলও ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। লণ্ডনে আগমন করিয়া কিছুদিন অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। পিতার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, তিনি বাল্যকালে ভালরূপে লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। এক্ষণে তিনি, অধ্যবসায়বলে ইংরাজী ও অপর দুই একটী ভাষা শিক্ষা করিলেন। ক্রমে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থের অনাটন বশতঃ একটী ভাল দূরবীক্ষণ ক্রয় করিতে না পারিয়া, নিজ হস্তে দূরবীক্ষণ গঠন করিয়া, তাহার সাহায্যে হর্শেল গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই ঘটনায় তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত হইল—তিনি পণ্ডিত সমাজে গণনীয় হইলেন।

কথিত আছে যে, যখন তিনি কার্য্যে বসিতেন, গভীর মনোযোগের সহিত ক্রমাগত ১২।১৪ ঘণ্টা কার্য্য করিতেন ; এমন কি, অনেক সময়ে আহার করিবার অবকাশ থাকিত না।

অধ্যবসায় সম্বন্ধে সার উইলিয়ম জোন্সের চরিত্র আলোচনার বিষয়। অতি অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার গুণবতী জননীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। শিশু জোন্স জননীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন,—"পাঠ করিলে জানিতে পারিবে।" জননীর আশা অনুযায়ী বাল্যকালেই তাঁহার পঠনা-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। সেখানে প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু এক দণ্ডের জন্যও জ্ঞানানুশীলনে বিরত ছিলেন না। কিছু দিন পরে, ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে পারসী ও কিয়ৎ পরিমাণে আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এসিয়া খণ্ডের লোকের রীতি নীতি পর্য্যালোচনার মানসে, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিতে সমুৎসুক

ছিলেন। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। সরকারী কার্য্যের গুরুভার সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানলাভ চেষ্টায় বিরত ছিলেন না। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, শকুন্তলা নাটক, মনুসংহিতা এবং মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি তাঁহারই যত্নের ফল। তিনি নানা ভাষায় ও বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাঁহার সময় নিরূপিত থাকিত। তাঁহার সময়-বিভাজন সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটী কবিতা আছে, তাহার মর্ম্ম এই :—

সাত ঘণ্টা আইন আলোচনায়,
সাত ঘণ্টা বিরামময়ী নিদ্রায়,
দশ ঘণ্টা অন্য কার্য্য সমাধায়,
সমস্ত সময় ঈশ্বর সেবায়,

অর্পণ করা আবশ্যক।

প্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকারের চরিত্রে অধ্যবসায়ের যেরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেরূপ এদেশে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মামজোয়ানি গ্রাম তাঁহার

পৈতৃক আবাসভূমি। তাঁহার পিতা পূর্ণিয়া জেলায় কোন জমীদারের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সেই খানে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অসহায় শ্যামাচরণ বিপদসাগরে পতিত হইলেন। পিতা যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাই ব্যয় করিতেন, পুত্রের জন্য ধন সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেই খানে তাঁহার প্রথম জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হয়। তখন আদালতে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক অভাবে পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট পুস্তক যাচ্ঞা করিয়া তাহা নকল করিয়া লইতেন। তৈল অভাবে প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। আহার অভাবে অনেক সময় সিক্তচণক ভক্ষণে ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাঁহার অদম্য জ্ঞান-লালসা কিছুতেই প্রশমিত হইল না। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কিয়ৎ পরিমাণে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া অসহায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। ১০৲ টাকা বেতনে একজন সাহেব

জমীদারের মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। পাছে প্রভুর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হয়, এই আশঙ্কায় ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ঘোরতর বিপদে পতিত হইলেন; আত্মরক্ষা ও জননীর ভরণপোষণের কোনই উপায় নাই। এই সময়ে কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত কলিকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। শ্যামাচরণের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে আপন বাসায় স্থান দিলেন। বাসায় পাচক না থাকাতে সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। শ্যামাচরণ অতি দৃঢ়কায় ও সবল পুরুষ ছিলেন। তিনি আনন্দের সহিত কেবল রন্ধনকার্য্য করিতেন এমন নহে, কিন্তু পুষ্করিণী হইতে কক্ষে ও মস্তকে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করিতেন। এই অবস্থায় তিনি বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি ডি রোজারিও নামক পুস্তক বিক্রেতার অধীনে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সূত্রে সার চার্লস্ ট্রিভিলিয়ান্ সাহেবের সহিত পরিচয় হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে নিজ মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বিরাম নাই; তিনি ক্রমাগত ইংরাজী, পারস্য ও

উর্দ্দু ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইত। এক্ষণে তাঁহার আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে মাদ্রাসার প্রধান প্রধান মৌলবির নিকট আরবী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভাষা শিক্ষা জন্য তিনি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে ১০টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হইত। তিনি উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহায্যে ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাত্র ৮ বা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে উর্দ্দু, হিন্দি ও বঙ্গ ভাষা শিক্ষা দিতেন। সুতরাং দিবা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্র ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি ক্রমাগত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, আহারাদির কোন সময় পাইতেন না। এইরূপে তিনি অন্যূন ছয় বর্ষ যাবৎ গভীর পরিশ্রমে রত ছিলেন। রাত্র ৯টার পর বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে রজনীনির্ম্মিত দুই চারিখানি রোটিকা ভক্ষণ করিয়া

কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিতেন। গমন সময়ে কিছু শুষ্ক চণক সঙ্গে লইতেন, ক্ষুধা হইলে তাহা চর্ব্বণ করিতেন।

এইরূপ গভীর মনোবল ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া, ক্রমে তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। দুরবস্থা ও প্রতিকূল ঘটনাবলী ক্রমে তাঁহার বীরত্বে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ৭০~ মুদ্রা বেতনে সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত শিখিবার উপায় উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় যে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণের সহায়তায় তাহা বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতে পেশকারের পদে নিযুক্ত হইলেন। সুচারুরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদন করায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৪০০ মুদ্রা বেতনে অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কার্য্যদক্ষতাগুণে জজেরা সন্তুষ্ট হইয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রধান ইণ্টারপ্রেটার বা দোভাষীর পদে নিযুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন দেশীয় লোক

ঐ পদ প্রাপ্ত হন নাই। অতঃপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনিই দেশীয় লোকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে "ঠাকুর ল-প্রফেসর" বা আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং প্রশংসনীয়রূপে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। *

উপরে যাহা বলা হইল, সচরাচর লোকের জীবনের পক্ষে তাহাই গুরুতর কার্য্য। কিন্তু শ্যামাচরণ কেবল জ্ঞানলাভ ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি লব্ধজ্ঞানকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাঁহার ভূয়োদর্শন ছিল। তাঁহার প্রণীত বঙ্গদেশ-প্রচলিত দায়ভাগ-সম্মত ব্যবস্থাদর্পণ নামক গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। এই গ্রন্থের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবিষয়ক গ্রন্থ অতি বিরল। তিনি দুই বর্ষ যাবৎ "ঠাকুর" আইন অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার ফলস্বরূপ সিয়া ও সুন্নি মুসলমানদিগের যে মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ন্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রণীত ব্যবস্থাচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য সর্ব্বদেশ-প্রচলিত

---

* উল্লিখিত ঘটনাবলী শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্যাল প্রণীত A General Biography of Bengal Celebrities নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাও অতি গভীর ও উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রবল চেষ্টা ও গভীর মনোবলে কিরূপে দুরবস্থা ও প্রতিকূল ঘটনাবলী অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায়, শ্যামাচরণ সরকারের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহার চরিত্রে প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ ছিল এবং তাহা এদেশে চিরদিন আদর্শচরিত্ররূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে দুরবস্থার সহিত যেরূপ ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, প্রবল মনোবল ব্যতীত তাহাতে জয়লাভ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার সাহস ও বীরতাপূর্ণ হৃদয় এক দিনের জন্যও বিচলিত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই। তিনি ক্রমাগত জ্ঞানপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাপুরুষের ন্যায় সহায়তা-লাভের প্রতীক্ষায় কখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জ্ঞান-লাভের যখন যে কোন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ়রূপে আয়ত্ত করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। দুরবস্থাপীড়িত হইয়া জ্ঞানলাভের যে মহদ্দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের অনুকরণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

মানসিক অপচয় (অবশিষ্টাংশ)।

আত্মনির্ভর।—আত্মনির্ভর-শক্তি অভাবে জীবনের প্রভূত অপচয় হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবে। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ তাহার একমাত্র উপায়। কর্ত্তব্যপালন জন্য—উন্নতিলাভ জন্য—কখনও অন্যের মুখাপেক্ষা করিও না। ইহা সত্য বটে, অনেক সময়ে আমাদিগকে অপরের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতে হয়; কখন কখন উপযুক্ত সময়ে অপরের প্রদত্ত সাহায্যে আমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু সেরূপ সহায়তা প্রাপ্ত না হইলেই যে আমাদের উন্নতির গতিরোধ হইবে—আমরা জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইব—কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইব—ইহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল সংস্কার বশতঃ এদেশের বহুসংখ্যক যুবক, উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চেষ্ট ও হীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ক্লেশকর দৃশ্য!

তুমি কি কখন ভাবিয়াছ যে, সাহায্যের আতিশয্যে সময়ে সময়ে আমাদের মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে? যাহারা প্রথম হইতে অজস্র সহায়তা প্রাপ্ত হয়—অন্যের সহায়তায় বর্দ্ধিত, শিক্ষিত ও সংসারে চালিত হয়—তাহাদের মনের বিকাশ অসম্পূর্ণ হয়,—অভাববশতঃ যে সকল শক্তি বিকাশিত হইতে পারিত, তাহা নিদ্রিত থাকে—তাহারা অবস্থা-সংগ্রামের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

যদি সাহায্য প্রাপ্ত হও, প্রয়োজন অনুসারে, স্বচ্ছন্দে তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু তাহার উপর কখন নির্ভর করিও না—তাহার প্রতীক্ষায় বা তাহার অভাবে কখন উন্নতিচেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইও না। যদি কর্ত্তব্য পালনে, জ্ঞান লাভে তোমার প্রবল ইচ্ছা থাকে, তবে তোমার শরীর ও মনে বিশ্বনিয়ন্তা যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে সেই শক্তির উপর নির্ভর কর—আত্মনির্ভর কর—কখন বঞ্চিত হইবে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আত্মনির্ভর-ক্ষমতাকে চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাদের আত্মনির্ভরশক্তি নাই, তাহাদের চরিত্রের সবলতা বা দৃঢ়তা নাই—তাহারা মহৎ কার্য্য-সাধনের যোগ্য পাত্র নহে—তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভীরু ও কাপুরুষ। যদি এই শক্তি পুনঃপুনঃ চালনা

দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে পার, এবং অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে পার, তবে মনুষ্যের সাধ্য কোন কার্য্যই তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। অতএব, সুযোগ বা সহায়তা লাভের প্রতীক্ষায় বা কল্পনায়—উপাদান অভাবে আপনাকে শক্তিহীন জ্ঞান করিয়া—অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিও না। তোমার সমস্ত শক্তি তোমার আয়ত্তাধীনে—কিন্তু সাহায্যকারীর শক্তি তোমার অধীনে নহে। আভ্যন্তরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত উপাদান লইয়া অগ্রসর হও—আপনার সহায় আপনি হও, ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন—তোমার মনে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি জাগরিত হইবে—সুযোগ, সহায়, উপাদান, ক্রমে সমস্তই উপস্থিত হইবে। যদি নিজ আভ্যন্তরিক শক্তি যথোচিতরূপে পরিচালিত করিতে পার,—প্রবল, অদম্য মনোবেগের সহিত উপস্থিত উপাদান লইয়া অগ্রসর হইতে পার, —তবে, অভাব-পীড়িত ক্ষুধায় ব্যথিত ভগ্নোৎসাহ সেনাদলের নেতা হইয়া, আল্‌প গিরির অবরোধ দূর করিয়া, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় ইটালি-সমরে জয়লাভ সম্ভব হইবে—টমাস্ এডওয়ার্ডের ন্যায় বিনা সম্বলে জ্ঞান ও খ্যাতি লাভ সম্ভব হইবে —রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সহস্র বাধা বিঘ্ন

অতিক্রম করিয়া জ্ঞানলাভ ও দেশের মঙ্গলসাধন সম্ভব হইবে।

স্থিরচিত্ততা—আত্মশাসন।—মনের অস্থিরতা বশতঃ জীবনের প্রভূত অপচয় হইয়া থাকে। ইতি-পূর্ব্বে মনের চপলগতি-জাত অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় অসম্ভব ও দূষিত কল্পনা এবং দুর্ভাবনার পৃথক্ উল্লেখ করা হইবে। এ সমস্তই অল্প বা অধিক পরিমাণে মনের অস্থিরতা উৎপাদন করে, কিন্তু ইহা ব্যতীত চিত্ত-চাঞ্চল্যের অপরাপর অনেক হেতু আছে। পূজনীয় আর্য্যজ্ঞানিগণ রিপুগণকে প্রশমিত করিবার আবশ্যকতা পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্রিয়া বশতঃ যে সর্ব্বদা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ যে কত অনিষ্ট, কত অমঙ্গল, কত যাতনা উপস্থিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা জ্ঞানানুশীলনের বিশেষ ব্যাঘাতকারী। এই হেতুবশতঃ মন দুর্ব্বল হয়, মীমাংসা দূষিত হয়, এবং প্রভূত পরিমাণে সময় নাশ হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর মানবমনে যে সকল বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহার একটীও অনাবশ্যক নহে। যে

বৃত্তি যে উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে ন্যায়সঙ্গত রূপে সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা উন্নতির প্রতিরোধক না হয়, পরন্তু জীবনধারণের—কর্ত্তব্য পালনের—সহায় হয়, আমাদের সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা শিক্ষা ও অভ্যাসগুণে সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারি। আত্মশাসন আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞানালোকিত মনের দৃঢ়তায় মনোবৃত্তিগণের অবৈধ ক্রিয়া নিবারণ মাত্র। সুতরাং জ্ঞানানুশীলনে বা অন্যান্য কর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইবার জন্য, আত্মশাসন অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। আত্মশাসন প্রভাবে অসঙ্গত আশা, অসঙ্গত চিন্তা, অসঙ্গত কল্পনা, অবৈধ ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, শত্রুনির্য্যাতন-কামনা, ইত্যাদি প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে—ন্যায়সঙ্গতভাবে কার্য্য করিতে পারিবে—দ্রুতপদে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইবে।

পুরাকালের ইউরোপীয় জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসের চরিত্রে আত্মশাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোন কারণ উপস্থিত হউক—তাহা যতই প্রবল হউক—কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত বা কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইত না। তাঁহার স্ত্রী জ্যান্থিপি

কলহপরায়ণা ও কটুভাষিণী ছিলেন। একদা সক্রেটিসের উপর নানা দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিয়া, পরিশেষে তাঁহার মস্তকে ময়লা জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সক্রেটিস্ ঈষৎ হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন :—"গর্জ্জনের পর বর্ষণই সম্ভব"। শত্রুগণ পুনঃ পুনঃ নির্যাতন করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অবশেষে, অন্যায় বিচারে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তিনি বীরভাবে এই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কোনমতেই ন্যায়বিমুখ বিচারকগণের নিকট জীবন ভিক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার কোন কোন শিষ্য, কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া, জীবন রক্ষার অনুরোধ করিয়াছিলেন। পলায়ন অপকর্ম্ম জ্ঞানে সক্রেটিস্ অসম্মত হইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও, তিনি ধীরভাবে আত্মার অবিনশ্বরতা ও পরকাল সম্বন্ধে, শিষ্যগণের সহিত কথোপকথনে রত ছিলেন। পরিশেষে, নিজহস্তে, হেমলক নামক লতার বিষময় রস পান করিয়া, সত্যনিষ্ঠ, গৌরবান্বিত জীবন নির্ব্বাপিত করিলেন।

নিউটনের স্থিরচিত্ততা অনুকরণীয় ছিল। চিত্তচাঞ্চল্যের বিশেষ হেতু উপস্থিত হইলেও, তিনি মানসিক তুল হারাইতেন না। কোন সময়ে তিনি

পঠনাগৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিলে, তাঁহার ডায়েমণ্ড নামক কুক্কুর একটী প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা তাঁহার লিখিত কাগজের মধ্যে নিক্ষেপ করিল— কাগজ জ্বলিয়া উঠিল—বহুদিনের পরিশ্রমের ফল নষ্ট হইল! তাহা দেখিয়া নিউটন কেবল এই মাত্র বলিলেন:—"ডায়েমণ্ড! ডায়েমণ্ড! তুমি জাননা যে কি অনিষ্ট করিলে।"

একদা একজন ভৃত্যের অজ্ঞতা বশতঃ বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত কারলাইলের ফরাসীবিদ্রোহিতা নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অগ্নিসাৎ হইয়াছিল। এই মহান্ অনিষ্টপাতেও কারলাইল ক্রোধে অধীর না হইয়া, ধীরভাবে, পুনরায় ঐ পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্থিরচিত্ততা ও আত্ম-শাসন অসাধারণ ছিল। যখন তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিপক্ষগণ, পুস্তক ও প্রবন্ধাদি দ্বারা, তাঁহার উপর আষাঢ়ের জলধারার ন্যায় কটু বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদুত্তরে রাজা কেবল শিষ্টবাক্য ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিজপ্রচারিত অসংখ্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদি মধ্যে, কোন স্থানে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ

একটী কথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কলিকাতা অবস্থান কালে, তাঁহার পরিচিত দুই ব্যক্তি, তাঁহার হৃদয়পরীক্ষা উদ্দেশে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অলীক-মৃত্যুসংবাদ-লিখিত একখানি জাল-চিঠি জাল-পত্র-বাহক দ্বারা তাঁহার হস্তে প্রদান করাইয়াছিলেন। পত্র পাঠে রাজার মুখ ম্লান হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র পরে, তিনি পত্র পাঠের পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিতেছিলেন, পুনরায় স্থিরভাবে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। পরিচিত ব্যক্তিদ্বয় সেই সময় রাজার নিকট বসিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত মনোবল দৃষ্টে, বিস্মিত-হৃদয়ে তাঁহারা রাজার চরণতলে পতিত হইলেন এবং জাল-চিঠির কথা ব্যক্ত করিলেন।*

বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত রোরুদ্যমান ভ্রাতার মুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বলিয়াছিলেন:—"পিতার সময় হইয়াছে, তিনি গিয়াছেন, তার জন্য আবার দুঃখ কি?"†

মীমাংসা।—মীমাংসা-শক্তির যথোচিত পরিচালন অভাবে, অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় এবং নানা অমঙ্গল উপস্থিত হয়। কারণ, প্রায় সকল কার্য্যেই,

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৬০ পৃষ্ঠা।

† শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত অক্ষয়চরিত, ১১ পৃষ্ঠা।

সকল অবস্থাতেই এই শক্তির ক্রিয়ার প্রয়োজন। সুতরাং ইহার উপর, কর্ত্তব্য পালন, উন্নতি ও অবনতি, সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই শক্তির ক্রিয়া স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রকৃতি, এবং অর্জ্জিতজ্ঞান ও সংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমরা যাহাকে উপস্থিত-বুদ্ধি বলিয়া থাকি, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল মীমাংসা-শক্তির ফলমাত্র।

আমরা যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শীঘ্র মীমাংসা করিতে না পারি, তবে নিশ্চয়ই সময়ের অপব্যয় হইবে এবং তাহার আনুষঙ্গিক নানা অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এ সম্বন্ধে তুমি অন্যের সাহায্য পাইতে পার। কখন কখন তাহা প্রার্থনীয়। বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া আমরা উপকৃত হইতে পারি; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরামর্শ দানের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করাও সহজ বিবেচনার কার্য্য নহে। কত সময়, অদূরদর্শী বা ন্যায়জ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তির পরামর্শে নির্ভর করিয়া আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়। সচরাচর লোকে পরামর্শদান অতি সহজ কার্য্য মনে করেন; এবং কোন বিষয়ক মীমাংসা করিবার জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহা ভালরূপে বিবেচনা না করিয়া,

অকাতরে দিবা রাত্র পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি গুরুতর কার্য্য। তিনি জ্ঞাত আছেন যে, পরামর্শ-গৃহীতার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা না করিয়া, পরামর্শ দেওয়া অপকর্ম্ম।

তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ সম্বন্ধে উপযুক্ত লোকের মত লইতে পার, তাহা অনুচিত নহে; কিন্তু কখন অন্ধভাবে তাহার উপর নির্ভর করিও না। তোমার শুভাশুভের বিষয় তুমি স্বয়ং যেমন বিচার করিতে সমর্থ হইবে, সকল সময় অন্যে সেরূপ পারিবে না; কারণ, তোমার নিজের বিষয়ে তোমার যেমন ঘনিষ্ঠজ্ঞান, অন্যের তাহা থাকা সম্ভব নয়। আর, অন্যের প্রদর্শিত পথে তুমি সর্ব্বদা চালিত হইলে তোমার স্বাধীনতা লোপ হইল। অন্যের সহায়তা লও, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে স্বয়ং মীমাংসা করিবে। অন্যের মত বা উপদেশ যদি তোমার বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞানের অনুমোদিত হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই তোমার গ্রাহ্য ও পালনীয়।

অভ্যাস দ্বারা বিচারশক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অভ্যাসের প্রধান উপায় ঐ শক্তির পুনঃ পুনঃ চালনা। যখন কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে, তখন সেই বিষয়ক সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপে

বিবেচনা করিবে, তাহার অনুকূল প্রতিকূল সমস্ত যুক্তি মনে ধারণা করিয়া তাহাদের লঘুত্ব গুরুত্ব বিবেচনা করিবে, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা স্থাপিত করিবে, এবং তৎপরে অনুকূল বা প্রতিকূল যে পক্ষ প্রবল হইবে, তাহাই তোমার গ্রাহ্য হইবে।

বিচারকার্য্য বড় কঠিন ব্যাপার। যখন কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সম্পূর্ণরূপে অপক্ষপাত হৃদয়ে ও শান্ত চিত্তে তাহা করিবে। পক্ষপাতিতা-শূন্য হওয়া সহজ কথা নহে। অনেক সময়, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিচার ঠিক হয় না, কারণ সংস্কার অনেক সময় ভ্রমপূর্ণ হয়। অনেক সময়, শিক্ষা দোষে এবং বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বিচার ভ্রমসঙ্কুল হয়। অনেক সময়, লোভ, ক্রোধ, ভয়, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদিতে তোমার যুক্তি-চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয় এবং মীমাংসা দূষিত করিয়া নানা বিপদ উপস্থিত করে। এই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমার মীমাংসা নির্দ্দোষ হইল কি না জানিবার জন্য, সেই বিষয়ে, বন্ধু বান্ধবের সহিত তর্ক করা মন্দ নহে; কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। কখন কখন তোমাকে অচিরাৎ উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। হয়ত, সেই মীমাংসা

দ্বারা তোমার ভাবী শুভাশুভের সূত্রপাত হইবে। তখন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিজ বিবেচনাশক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে। মীমাংসা যতই ভ্রমশূন্য হইবে, ততই মঙ্গল হইবে—ততই অপচয় নিবারিত হইবে। এ সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞান তোমার পরম সহায়।

স্বাধীনচিন্তা ও পুস্তকপাঠ।—আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে স্বাধীনচিন্তা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। আমরা কর্ত্তব্যপালনে যথোচিতরূপে স্বাভাবিক বুদ্ধি পরিচালিত করিব—স্বাধীনযুক্তি প্রয়োগ করিব—সকল বিষয়ের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে যত্নবান হইব—ইহা প্রথমতঃ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুভূত হইবে যে, এই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মানুসারে কার্য্য না করাতেই আমাদের নানা অমঙ্গল ঘটিতেছে—আমরা প্রকৃতরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না—কেবল পুস্তকবিশারদ হইতেছি।

পুস্তকপাঠের আবশ্যকতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। এ যাবৎ কাল মানবের বুদ্ধিবলে যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পুস্তকরূপ ভাণ্ডারে নিহিত রহিয়াছে। পঠনা দ্বারা আমরা

সেই জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু পুস্তক-পাঠ জ্ঞানলাভের একটী উপায় মাত্র। বাঁটালি ও মুদ্গার যেমন সূত্রধরের গঠন কার্য্যের সহকারী, পুস্তকও সেইরূপ আমাদের জ্ঞানলাভের সহায়। তাহা জ্ঞানলাভের মূল বা একমাত্র উপায় নহে।

পুস্তক পাঠ কর—পুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয় জ্ঞাত হও—কিন্তু সাবধান! কখন অন্ধভাবে গ্রন্থকারের মত গ্রহণ করিও না,—নিজবুদ্ধি ও যুক্তিবলে সর্ব্বদা তাহার সত্যাসত্য মীমাংসা করিতে যত্নবান হইবে। তুমি পুস্তক পাঠে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পার—জীবন কাটাইতে পার—কিন্তু পুস্তক-লব্ধ-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তা অভাবে সম্পূর্ণরূপে ফলোপ-ধায়ী হইবে না। যখনই কোন গুরুতর বিষয় মনের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখনই আপনার অভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব করিবে। পঠনা কর—পঠনা দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানকে আয়ত্ত কর। কিন্তু ইহাতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। একগুণ পঠনা করিবে, দশগুণ চিন্তা করিবে—পুস্তকলব্ধ-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তা দ্বারা বর্দ্ধিত করিবে—পঠনাকে স্বাধীন-চিন্তার সহায় করিয়া লইবে। ইহা ব্যতীত পঠনা কিছুতেই তোমার পক্ষে সম্যকরূপে ফলোপধায়ী হইবে না—তুমি কেবল পুস্তক-কীটবৎ হইয়া পড়িবে। যাহা

পাঠ করিবে—যাহা শিক্ষা করিবে—তাহা সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্তাধীন করিয়া লইবে। নতুবা কার্য্য-কালে বঞ্চিত হইবে—পুস্তকস্থ বিদ্যা তোমার সহায় হইবে না।

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিবে। যখন যে পুস্তক সম্মুখে পড়িল, তখনই তাহা পাঠ করা শিক্ষা লাভের উৎকৃষ্ট উপায় নহে। তুমি যখন যে বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হইবে, যে সকল পুস্তক পাঠে সেই বিষয়ের সহায়তা হইতে পারে, তখন সেই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিবে। কখন কখন আনন্দলাভ উদ্দেশে পুস্তক পাঠ করা হইয়া থাকে। যে সকল পুস্তক পাঠে আনন্দলাভের সহিত শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাই পাঠ করা কর্ত্তব্য। যে সকল পুস্তক পাঠে কুচিন্তা ও কুরুচি সঞ্চার হয়, তাহা বর্জ্জন করিবে। যখন যে পুস্তক পড়িবে, তাহার অর্থগ্রহ করিয়া আনু-পূর্ব্বিকভাবে তাহা পাঠ করিবে।

যে সকল মহানুভব নিজজ্ঞান ও প্রতিভাবলে জগতের অজ্ঞানতা দূর করিয়াছেন—ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন—বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন—সাহিত্য-কানন সুশোভিত করিয়াছেন—তাঁহা-দের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখিবে যে, স্বাধীন-

চিন্তা, স্বাধীন যুক্তিই তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির প্রধান সহায়,—স্বাধীনচিন্তাবলেই তাঁহারা জগতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি মহৎ কার্য্য করিতে চাও, স্বাধীন-চিন্তা অভ্যাস কর।

যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে, তখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়মানুসারে স্ফূর্ত্তিযুক্তহৃদয়ে, অনন্যমনা হইয়া ধীরভাবে চিন্তা করিবে। এক সময়ে নানা বিষয়ক চিন্তাকে কখন মনে স্থান দিবে না; যদি দেও, কখন কোন বিষয়ে গভীরভাবে বা উত্তমরূপে চিন্তা করিতে পারিবে না এবং চিন্তা ফলবতী হইবে না। যখন চিন্তা করিবে তখন একটী বিষয় লইয়া করিবে, সেটী শেষ হইলে অপর একটী বিষয় লইবে। যদি চিন্তার বিষয় অনেক থাকে, তবে মুখ্য গৌণ বিবেচনায়, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক সময় নিরূপিত করিবে। এই নিয়মে কার্য্য করিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক বিষয় সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।

চিন্তার বিষয় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিবে, এবং ব্যবস্থাপূর্ব্বক, নিয়মিতরূপে, সহিষ্ণুতার সহিত চিন্তা করিবে। অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত চিন্তায় অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। যাহা জ্ঞানোন্নতির

সহায়—কর্ত্তব্যপালনের সহায়—সেই সকল বিষয়ে চিন্তা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবে, যতক্ষণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পার, তাহাকে ছাড়িবে না—কিছুতেই ছাড়িবে না। সর্ব্বদা তাহাকে মনের সম্মুখে উপস্থিত রাখিবে। তোমার সময় ও কার্য্য বিবেচনায়, মধ্যে মধ্যে সেই বিষয়ে চিন্তা করিবে। পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত তাহা কোন মতেই ফলবতী হইবে না। কিছুকাল যাবৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার সত্য নিরূপণ সম্বন্ধে এই নিয়ম। একদা নিউটনের কোন বন্ধু, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করাতে, তিনি বলিয়াছিলেন :—"আমার ধীশক্তি অসামান্য নহে। আমি যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল চিন্তা সম্বন্ধীয় পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা বলে। আমি যে বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, সেই বিষয়টীকে সর্ব্বদা মনের সম্মুখে রাখিয়া সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকি, যতক্ষণ সত্যের প্রাত্যাতিক মৃদুল আলোক, পূর্ণ ও পরিষ্কার আলোকে পরিণত না হয়।" এই কয়েকটী অমূল্য বাক্যের মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার সত্য

নিরূপণ সম্বন্ধীয় উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিষয় পরিবর্ত্তনে, অসম্পূর্ণ, অনিয়মিত চিন্তায়, মনের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং কোন বিষয়েই বিশেষ ফল লাভ হয় না।

চিন্তার ফল সর্ব্বদা লিপিবদ্ধ করিবে। আপাততঃ তাহাতে বিশেষ ফল লাভ হউক বা না হউক, ক্রমাগত চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবে,—সময়ে দেখিবে, আশাতীত ফল লাভ করিয়াছ। তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ, কত সময়ে তোমার মনে অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব উদিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় ক্ষণকালমাত্র ছায়া বিস্তার করিয়া চলিয়া গিয়াছে—আর তাহাদের কোন চিহ্ন নাই! যদি চিন্তাফল লিপিবদ্ধ করিতে, তবে এত দিন কত উৎকৃষ্ট বিষয়—অমূল্য রত্ন—জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। চিন্তাফল লিপিবদ্ধ করার আর এক উপকারিতা এই যে, চিন্তিত বিষয় আকার প্রাপ্ত হইয়া মনকে উৎসাহিত করে ও পুনরায় সেইদিকে লইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ বিষয়-পরিবর্ত্তন-বাসনা দুর্ব্বল হয়, এবং সহজে যুক্তির শৃঙ্খলা স্মরণ করিয়া রাখা যায়। আবার, চিন্তিত বিষয়ে তুমি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিবে, এই উপায়ে তাহার দোষ গুণ, গুরুত্ব লঘুত্ব, সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিবে এবং উত্তমরূপে

উপস্থিত বিষয়ের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নিরূপণে সমর্থ হইবে।

পর্য্যবেক্ষণ।—পর্য্যবেক্ষণ জ্ঞানলাভের এক প্রধান উপায়। তোমার চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা নানা বিষয় পতিত হইতেছে। বিশেষ হেতু না থাকিলে, তুমি প্রায়ই তাহা ক্ষীণদৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছ—তোমার মনে আর তাহাদের কোন চিহ্ন রহিতেছে না। হয়ত, সময়ান্তরে সেই সকল বিষয়ক জ্ঞান তোমাব পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে, এবং তাহার অভাবে সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে,—হয়ত অন্যান্য প্রকারেও ক্ষতি হইতেছে। যখন যাহা দেখিবে, তাহা যথাসম্ভব মনোযোগের সহিত দেখিবে, তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান তাহাতে প্রয়োগ করিলে, তাহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কিছুদিন ব্যবহারে ইহা অভ্যাস হইয়া যাইবে, সর্ব্বদাই কিছু নূতন শিখিতে পারিবে এবং ক্রমে তোমার জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। প্রখর দর্শনশক্তি প্রবল মীমাংসা-শক্তির সহায়।

একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানলাভ জন্য সহস্র সহস্র দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। এখন যে অবস্থায় পতিত, সেই

অবস্থাতেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। তুমি বলিবে, পুস্তক পাঠ না করিলে—অধ্যাপকের জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ না করিলে—যন্ত্রাদি লইয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত না হইলে—কিরূপে জ্ঞানলাভ হইবে? এ সমস্তই জ্ঞানলাভের উপায় সন্দেহ নাই, কিন্তু মনে করিও না ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তোমার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অতি ক্ষীণ বলিয়াই তুমি অনেক সময়ে জ্ঞানলাভে বঞ্চিত। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর—পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর—প্রাণী-জগতে, উদ্ভিদ-জগতে, জড়-জগতে, মানব-মনে, মানব-দেহে, মানবসমাজে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে; তুমি চেষ্টা করিলেই নানা রত্ন লাভ করিতে পার। তুমি শুনিয়া থাকিবে যে, ক্যাল্‌ডিয়া দেশীয় রাখালেরা প্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি হইবার বহুদিন পূর্ব্বে যে ঐ বিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা কেবল দর্শনশক্তি-বলে। তুমি হয়ত চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন জ্যোতিষ্কের উদয়াস্ত সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পার না। পৃথিবী জীবপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সহস্র সহস্র প্রাণী সদা তোমার চক্ষের সম্মুখে

জন্মিতেছে। তুমি তাহাদের মধ্যে কয় প্রকার জীবের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী জ্ঞাত আছ? তোমার আবাসভূমির চারিদিকেই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইবে। তাহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় কিরূপে সাধিত হয়—কিরূপে তাহারা ফল ফুল প্রসব করে—তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ—তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি,—এ সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে?

মানব দেহ-যন্ত্র কি অসীম ও অপার কৌশলে গঠিত! কিরূপে সেই যন্ত্র চলিতেছে—কিরূপে দৈহিক শক্তি উৎপাদিত হইতেছে—কিরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—মন ও বহির্জ্জগতের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ,—তুমি কি এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছ? মানব-মন বিচিত্র ব্যাপার! কিরূপে জ্ঞানহীন শিশুর মন ক্রমে ক্রমে বিকাশমান হয়—কিরূপে বাহ্যজগৎ তাহার বিকাশ-সাধনের সহায় হয়—কিরূপে মনোবৃত্তিসকল ক্রিয়াবান হয়,—তুমি কি তাহা ভাবিয়াছ? তোমার চতুর্দ্দিকে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক খেলিয়া বেড়াইতেছে—তুমি কি তাহাদের মানসিক প্রক্রিয়ার দিকে কখন দৃষ্টি করিয়াছ? কিরূপে তাহাদের অনুসন্ধা-

নেচ্ছা জাগরিত হইতেছে—অল্পে অল্পে বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বাড়িতেছে—বহুদর্শিতা হইতেছে—একটী একটী করিয়া নানা বিষয়ক সংস্কার ফুটিতেছে,—তাহা কি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ? জ্ঞানলাভ উদ্দেশে মানবচরিত্র কি কখন আলোচনা করিয়াছ? কোন্ অবস্থায় মনের ক্রিয়া কিরূপ হয়, শিক্ষা, সংস্কার, ইত্যাদি কারণে তাহার কিরূপ প্রভেদ হয়, তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছ? প্রতিদিন নানা পদার্থ তোমার প্রয়োজনে আসিতেছে,—তাহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কতদূর? কিরূপে মানব জাতি সমাজবদ্ধ হইয়াছে—কিরূপে ক্রমে ক্রমে সমাজ-যন্ত্র দীর্ঘায়তন হইয়াছে, নানাবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে—কোন্ কোন্ শক্তিবলে সেই যন্ত্র চালিত হইতেছে—কিরূপে সেই সকল শক্তি ক্রিয়াবান হইতেছে,—তুমি কি তাহা জ্ঞানচক্ষে দেখিয়াছ?

যে দেশ তোমার জন্মভূমি, সেই দেশে শত শত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। কিরূপে সেই সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে—কিরূপে জাতীয়বন্ধন নির্ম্মিত হইয়াছে—কিরূপে সেই সকল জাতি জীবন ধারণ করে—কিজন্য সেই সকল জাতি মধ্যে সামাজিক অবস্থার বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়—

তাহাদের ভাষা, তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ,—তুমি এই সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন অনুসন্ধান করিয়াছ?—এসকল বিষয়ে কখন চিন্তা করিয়াছ? যে দেশে তোমার বাস, সেই দেশের উর্ব্বরতা চিরবিখ্যাত। ভূমিরও অনাটন নাই—শ্রমজীবী লোকও অসংখ্য আছে। কখনও কি ভাবিয়াছ, তথাপি কিজন্য দারিদ্র্য বিকট বেশে চারিদিকে বিভীষিকা দেখাইতেছে—শান্তি-ভঙ্গ করিতেছে? তুমি কি কখন অনুসন্ধান করিয়াছ, কোন্ ভূমিতে কি উৎপাদিত হইতে পারে—কিরূপে উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে—কিরূপে পরিশ্রম সম্যকরূপে ফলোপধায়ী হইতে পারে—অপচয় নিবারিত হইতে পারে? এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ে যদি জাতীয় মন ধাবিত হইত, তবে ভারতভূমি সৌভাগ্যশালিনী হইত সন্দেহ নাই।

যেমন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবে, সেইরূপ পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়মানুসারে, জ্ঞাত-বিষয়গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিবে; নতুবা নানা বিষয় মনে সমাগত হইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং ভাবীশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। পর্য্যবেক্ষণফল সর্ব্বদা লিপিবদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা জ্ঞাতবিষয়গুলিকে

অপেক্ষাকৃত সহজে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারিবে—স্মৃতিগত করিতে পারিবে—সময়ে সময়ে সেই সকল বিষয়ের উপর ইচ্ছামত চিন্তা করিতে পারিবে, এবং এই উপায়ে লব্ধজ্ঞান ফলোপধায়ী হইবে।

মানসিক প্রক্রিয়ার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। মন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে কি না—দিন দিন জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে কি না—সর্ব্বদা তাহা দেখা আবশ্যক। এইরূপ অন্তর্দ্দৃষ্টি ব্যতীত মানসিক অপচয় সম্যকরূপে নিবারণ করা অসম্ভব। এই কার্য্যের জন্য পৃথক সময় নিরূপিত করা আবশ্যক। সেই সময়ে প্রতিদিনের কার্য্য আলোচনা করিবে—কি শিক্ষা করিয়াছ তাহা দেখিবে—কিরূপে তাহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পার তাহা বিবেচনা করিবে।

দূষিতকল্পনা—ভাবী সুখচিত্র।—ইতিপূর্ব্বে "মনের চপলগতি" ও "স্বাধীনচিন্তা" সম্বন্ধে, এক সময়ে নানা বিষয়ক চিন্তার অনিষ্টকারিতা ও তাহা পরিহারের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা মনের মহান্ অনিষ্টকারী ও উন্নতিরোধক আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

অনেক সময়ে, মনে এরূপ অনেক চিন্তা উপস্থিত হয়, যাহা আপাততঃ অত্যন্ত সুখকর; কিন্তু তাহা,

হয় অসম্ভব কল্পনাচিত্র, কিম্বা দূষিত কল্পনাচিত্র, কিম্বা আশানুযায়ী ভাবী সুখচিত্র, অথবা অসংলগ্ন নানা বিষয়ক চিন্তা। শেষোক্ত বিষয়ের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।

সুখকর অসম্ভব কল্পনাচিত্রের প্রলোভনে মন সদা তাহাতেই বাস করিতে চায়। যে সকল বিষয় পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য, সে দিকে পার্য্যমানে যাইতে চাহে না। সুতরাং জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্রমসাধ্য কার্য্যে মন উৎসাহিত হয় না, এবং তাহাতে যথোচিতরূপে মনোনিবেশ করিতে পারা যায় না, কাযেই তাহা সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং জীবনের প্রভূত অপচয় এবং নানা দুঃখ ও অসুবিধা উপস্থিত হয়। আবার, প্রকৃত ও শ্রমসাধ্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে যথোচিতরূপে মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা ভালরূপে উপলব্ধি করা যায় না এবং সেই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী শক্তি মনে বিকাশিত হয় না, সুতরাং উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যে সকল কার্য্য তুমি অন্যায় জ্ঞানে, অকর্ত্তব্য জ্ঞানে পরিহার করিতেছ, তাহা সাধনের কল্পনাকে কখন মনে স্থান দিবে না। যাহা কল্পনায় করা তোমার অভ্যাস হইবে, অবস্থা অনুকূল হইলে কার্য্যে

করাও তোমার পক্ষে সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে,—তোমার মনের অন্যায়-প্রতিবোধক-শক্তি হ্রাস হইবে, সুতরাং অন্য প্রকার অন্যায় কার্য্য করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। যে কার্য্য করিবে—যে চিন্তা করিবে—তাহাতে সততই ন্যায়পরতার ক্রিয়া আবশ্যক। কেবল অপকর্ম্ম কার্য্যে না করিলেই কেহ ন্যায়পরায়ণ হইতে পারে না। কার্য্যে এবং মনে ন্যায়পরায়ণ না হইলে যথার্থরূপে ন্যায়পরায়ণ হওয়া হইল না; তাহা না হইলে প্রকৃত উন্নতি ও মনুষ্যত্ব লাভ হইল না। চিন্তায়, কল্পনায় ন্যায়পরায়ণ না হইলে, কেহ কার্য্যেও যথার্থরূপে ন্যায়পরায়ণ হইতে পারে না; কারণ, মনের আভ্যন্তরিক ভাব কার্য্যকে সততই নিজবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে। সহসা তাহা অনুভব করা না যাইতে পারে, কিন্তু যখনই রাজশাসন বা সমাজশাসনের দুর্ব্বলতা হইবে—যখনই সুযোগ উপস্থিত হইবে,—তখনই কল্পনা-দূষিত মনের প্রকৃত মূর্ত্তি দৃশ্যমান হইবে—তখনই ন্যায়বিরোধী অপকর্ম্ম সাধিত হইবে। তুমি সর্ব্বদাই দেখিতেছ যে, যাহারা কখন দূষিত কার্য্য করে নাই, তাহারা সময়ক্রমে তাহা করিতেছে। তাহারা এত দিন কার্য্যে করে নাই বটে, কিন্তু মনে প্রলোভন, দূষিত-কল্পনা জাগ-

রিত ছিল, সময় পাইয়া তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হইল মাত্র। কোন প্রকার অন্যায় চিন্তা বা কল্পনা করিয়া অব্যাহতি নাই—তাহার বিষময় ফল দূর-গামী। তুমি যদি অপরকে প্রতারণা করিবার কল্পনা কর, তবে হয়ত অলক্ষিতে নিজ পিতাকেও প্রতারিত করিবে। যেমন প্রত্যেক সাধু ইচ্ছায় তুমি উন্নত হইতেছ, প্রত্যেক অন্যায় বা দূষিত চিন্তায় সেইরূপ অধঃপতিত হইতেছ। অতএব সাবধান! কখন চিন্তায়—কল্পনায়—স্থায়-দূষিত বিষয়কে স্থান দিবে না।

ভাবী সুখের চিত্র সুখকর সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বদা তাহাতে বিচরণ করিলে মনোদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। যদি সময় অনুকূল হয়—শুভদিন সমুদিত হয়—তবে কিরূপে সুখভোগ করা উচিত তাহা স্থির করা কঠিন হইবে না। যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনাকে কখন মনে স্থান দিবে না। যে অবস্থা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, তাহার আগমন কল্পনায় এখন কি জন্য ভোগ-বাসনা-পরিতৃপ্তি-চিত্র গঠন করিতেছ? বৃথা জীবন অতিবাহিত করিতেছ? মানসিক শক্তির অপচয় করিতেছ? দেখিতেছ না যে, তোমার চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল ঘটনাবলী ভ্রূকুটী করিতেছে, অভাব ভীষণ-বেগে তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন যদি

বৃথা অযৌক্তিক কল্পনায় সময় নাশ কর—মনকে রোগগ্রস্ত কর—তবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত সুখের দিন কখন আসিবে না। অতএব প্রবলবেগে যুক্তি-বিরোধী ভাবী সুখকল্পনা উৎপাটিত কর, দূরে নিক্ষেপ কর—বীরভাবে অবস্থা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও —ন্যায্যার্জ্জন সহায়ে ক্রমাগত পরিশ্রম কর—শত্রু নিপাত কর—শুভদিন আগমনের পথ পরিষ্কার কর।

এই সকল যুক্তিবিরোধী ভাবী সুখকল্পনা-চিত্রের আর এক মহা অনিষ্টকারী শক্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। যদিও তাহাতে আপাততঃ মনের উৎসাহ ও আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তাহা অপ্রকৃত ও মিথ্যা। যাহা অপ্রকৃত ও মিথ্যা তাহা সদা মনে ক্রিয়াবান হইলে, মনের অবস্থাও অপ্রকৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং তুমি অপ্রকৃতভাবপূর্ণ মনুষ্য হইয়া উঠ এবং অচিরাৎ অধঃপতিত হও। তোমার মনের ভাব আর তোমার প্রকৃত অবস্থোচিত থাকে না। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কাল্পনিক ও অপ্রকৃত উচ্চতার ভাব মনে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, সহসা তাহা অনুভব করা যায় না। এরূপ অবস্থায় যে তুমি সর্ব্বদা ভ্রমে পড়িবে—বিপদে পড়িবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার, এই সকল

কাল্পনিক যুক্তিবিরোধী সুখচিত্রে তুমি সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পার না। চতুর্দ্দিকস্থ প্রতিকূল ঘটনাবলীর কঠিন আঘাতে নিশ্চয়ই আচম্বিতে তোমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। তখন তোমার প্রকৃত অবস্থা—অসুবিধা, অনাটন, অভাব—ভীষণবেগে তোমার সম্মুখীন হইবে। তখন সেই অপ্রকৃত কাল্পনিক সুখ ও উৎসাহের পর, গভীর নিরাশা ও নির্জ্জীবতা আসিবে—আসিবেই আসিবে, কারণ ঘাত প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং যখন তোমাকে গভীর মনোবেগের সহিত অবস্থা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সেই সময়ে দুর্ব্বলতাপীড়িত হইয়া তুমি অবস্থার ক্রীড়া-বস্তুবৎ হইবে—স্পর্শ-মাত্রেই পরাজিত হইবে এবং যাতনাপূর্ণহৃদয়ে জীবন অবসান করিতে বাধ্য হইবে।

কল্পনাশক্তি।—কল্পনাশক্তি জ্ঞানোন্নতির এক প্রধান ও প্রবল সহায় এবং মানব হৃদয়ের প্রকৃত উন্নতির উপাদান। কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্মসাধন, যে দিকে যাও, কল্পনার সহায়তা ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব। কল্পনা ব্যতীত সাহিত্য-কানন কে ফলফুলে সুশোভিত করে? কল্পনা ব্যতীত কে বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে সহায় হয়? কল্পনা ব্যতীত ধর্ম্মজগৎ নীরস ও [illegible]।

মনের উৎকর্ষ সাধন জন্য শোভানুভাবকতাশক্তির বিকাশ নিতান্ত আবশ্যক। স্বভাবকাননের মনোহারিণী শোভা—মানব শিল্পনৈপুণ্য-রচিত নানাবিধ বস্তুর রমণীয় সৌন্দর্য্য—শোভানুভাবকতাশূন্য মনের সম্মুখে অরচিতপ্রায়। কল্পনাই শোভানুভাবকতার প্রসূতি। জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোহর তাহাই কল্পনার উপভোগ্য।

কল্পনা কেবল কাব্য ও উপন্যাসের জন্য প্রয়োজন, এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানলাভ জন্যই অল্প বা অধিক পরিমাণে কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা যখন যুক্তির সহিত সংযোজিত না থাকে তখনই তাহা জ্ঞানলাভের বিরোধী,—যুক্তি-সমন্বিত কল্পনা সর্ব্বদা জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। কল্পনা বলেই আমরা নানা বিষয়, নানা ঘটনা, কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া একত্রে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হই। এই উপায় দ্বারাই গ্রন্থকারগণ নানা বিষয় সুশৃঙ্খলার সহিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এক একটী পৃথক্ পৃথক্ সত্য লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অসংশ্লিষ্ট। কল্পনা ব্যতীত নানা বিষয়ক সত্যকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করা—তাহাদের উপর, আবার যুক্তি সংযোজিত করিয়া,

কোন প্রকার মত গঠন করা—এক বিষয়ক জ্ঞানকে বিষয়ান্তরে প্রয়োগ করা—পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানকে সত্য নিরূপণে প্রয়োগ করা—অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। পূর্ব্বলব্ধজ্ঞানবলে আমরা যখন কোন বিষয়ক অনুমান করিয়া থাকি, তখন কল্পনাশক্তি ক্রিয়াবান হয়। নিউটন যখন স্থির করিয়াছিলেন যে, যে শক্তিবলে বৃক্ষ হইতে ফল ভূতলে পতিত হয়, সেই শক্তিবলেই গ্রহগণ গগণমণ্ডলে স্থিত ও ভ্রাম্যমাণ হয়, তখন যুক্তি-সমন্বিত কল্পনা তাঁহার সহায় হইয়াছিল। আমরা বহির্জগতে নানা ঘটনা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকি। প্রত্যেক ঘটনার মূলে কারণ দৃষ্ট হয়। রোগ বা দুর্ঘটনায় কাহার মৃত্যু হইল—বায়ু দ্বারা বৃক্ষ উৎপাটিত হইল—অগ্নি দাহ করিল—জল শীতল করিল,—এইরূপ কারণ আজীবন সহস্র সহস্র ঘটনার মূলে দৃষ্টি করিয়া, সকল ঘটনার মূলে কারণ আছে ইহা উপলব্ধি করি। বৃক্ষ হইতে ফল ঊর্দ্ধগামী না হইয়া কেন ভুতলে পতিত হইল? ঐ পূর্ব্বলব্ধজ্ঞানবলে এই ঘটনারও কারণ অনুমিত হইতে পারে। জগতে শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বদাই দেখা যায়। শক্তিবলে নানা জড় পদার্থ চালিত হইতে দেখা যায়। এই জ্ঞানবলে এরূপ অনুমান হইতে

পারে যে, ফল ভূতলে পতিত হওয়ার কারণ শক্তি। এই প্রক্রিয়া দ্বারা, সেই শক্তি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। আবার, পৃথিবী জড়ময়—গ্রহগণও জড়ময়; যে শক্তি পৃথিবীতে আছে তাহা গ্রহগণেও থাকা সম্ভব, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ অনুমান যুক্তিসমন্বিত কল্পনার ক্রিয়া। নিউটন যাহা পূর্ব্বলব্ধজ্ঞানবলে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জারম্যান কবি ও জ্ঞানী গেটে (Gœthe) যখন মানবদেহে "ম্যাক্সিলারি বোন্" (বা উপরিভাগস্থ চুয়ালের মধ্যস্থ অস্থি, যাহাতে উপর পাটির সম্মুখস্থ দন্ত সংলগ্ন থাকে) নামক অস্থির অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন, তখন যুক্তিসমন্বিত কল্পনা তাঁহার সহায় হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ ম্যাক্সিলারি অস্থির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইরূপে অনুমান করিয়াছিলেন:—"বিশ্বরচনার সর্ব্বত্রেই কৌশলের একতা (Unity) দৃষ্টিগোচর হয়। যদি দন্তবিশিষ্ট অপরাপর প্রাণীদেহে ঐ অস্থি থাকে, তবে মানবদেহেও তাহা অবশ্য থাকিবে।"* এই অনুমান অনুসারে, অনুসন্ধানে

* Life of Gœthe by George Henry Lewis, p. 345. Third Edition, London, 1875.

প্রবৃত্ত হইয়া, ঐ অস্থির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন।

অতএব উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে তোমাকে কল্পনাশক্তি বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে—যুক্তিসমন্বিত করিয়া চালিত করিতে হইবে। যদি তোমার কল্পনাশক্তি স্বভাবতঃ প্রবল হয়, তবে তুমি তাহাকে যত্নের সহিত রক্ষা কর—নিয়মিত কর—যুক্তিযুক্ত করিয়া কার্য্যকর বিষয়ে—কর্ত্তব্য সাধনে—প্রয়োগ কর। তদ্দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে—হৃদয় উন্নত হইবে—এবং জীবনের প্রকৃত উপভোগ বৃদ্ধি হইবে।

কাল্পনিক উপন্যাসাদি পাঠে কল্পনা চর্চ্চা অপেক্ষা ইতিহাস, জীবনচরিত পাঠে তাহার উৎকর্ষ সাধন করা অধিকতর উপকারী। সামাজিক প্রক্রিয়া—মনের বিকাশ—বিশ্বরচনা—সৃষ্টিকৌশল—সত্য নিরূপণ, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। আমরা কেবল শুষ্ক ঘটনা লইয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না—ভাব আমাদের অর্দ্ধেক জীবন। উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠে মনের ভাব উন্নত হয়,—জ্ঞানালোকিত-মনঃ-প্রসূত উপন্যাসও উৎকৃষ্ট কাব্য বিশেষ। সুতরাং উৎকৃষ্ট কাব্য ও উপন্যাস পাঠে কল্পনা চালনা করা কোন

মতেই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ে কবিতা থাকে, তবে সংসারের চারিদিক কবিতাময় দেখিবে—শুষ্ক ঘটনাও সরস দেখিবে—দৈনিক গৃহ-ব্যাপারেও মনোহর জীবন্ত কবিতা প্রাপ্ত হইবে।

বিশেষ বিষয়ের অনুশীলন।—বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্য্য শেষ করিলেই শিক্ষা লাভ শেষ হইল, কখন এরূপ মনে করিও না। বিদ্যালয়ে কেবল জ্ঞান লাভের সূত্রপাত হইল মাত্র। বিদ্যালয়-লব্ধ জ্ঞানের সহায়তায় আজীবন জ্ঞানানুশীলন করিবে—মনের উন্নতিসাধন করিবে—সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করিবে—ইহাই তোমার কর্ত্তব্য—ইহাই তোমার নিয়তি। এই গুরুতর কর্ত্তব্য অবহেলন অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক অপকর্ম্ম কল্পনা করাও কঠিন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত কুবীর জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"ইহা আর কিছুই নহে, কেবল মানব মনকে তাহার নিয়-তির দিকে—জ্ঞানের দিকে—লইয়া যাওয়া মাত্র।" নিউটন বলিয়াছেন:—"আমরা জ্ঞান-সাগরের কূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।" যদি প্রকৃত উন্নতি চাও, অবিরামে আজীবন জ্ঞানচর্চ্চা কর। জ্ঞানলাভ যত অধিক হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

কিন্তু, (যেমন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে), সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ—চারিদিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। জ্ঞানের শত শত বিভাগ। এক বিষয়ক জ্ঞান শেষ করাই একজন মনুষ্যের পক্ষে সুকঠিন—নানা বিষয়ক জ্ঞানে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করা অসম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্য্য সমাধান পরে, যাঁহার যে বিষয়ে মনের গতি, ঐকাগ্রভাবে সেই বিশেষ বিষয়ের অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য। মনের সমস্ত শক্তি—সমস্ত বেগ—কোন বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে, বিশেষ উন্নতিলাভ অসম্ভব। নানা বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, মানসিকশক্তি বিভাজিত হইয়া প্রত্যেক বিষয়কে ক্ষীণভাবে স্পর্শ করে—কোন বিষয়েই সমীচীনা ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না—বিস্তৃতি অধিক হয় বটে, কিন্তু গভীরতা অতি অল্পই হইয়া থাকে। একটী দীপ দ্বারা একটী ঘর যেমন সুন্দররূপে আলোকিত হইতে পারে, একটী বিস্তীর্ণ গৃহ কখনই সেরূপ হইতে পারে না।

বিশেষ বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা শ্রম বিভাজিত হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। এই উপায়েই ইউরোপে দ্রুতবেগে জ্ঞানোন্নতি হইতেছে। ইহা সত্য বটে যে, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এদেশে অনেকের পক্ষে বিশেষ বিষয়ের অনুশীলন সম্ভবপর হয় না; কিন্তু

কতকগুলি ব্যক্তি যে তাহা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জ্ঞানসমাপন চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা অধ্যবসায়শীল, তাঁহারা ইংরাজী পুস্তক পাঠেই জ্ঞানচর্চ্চা পর্য্যাপ্ত মনে করেন। স্বাধীন চিন্তা, সত্যান্বেষণ, নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের চেষ্টা প্রায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, কোন প্রকারে নিজ নিজ অর্থকরী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য মনে করেন। চিকিৎসক রোগীকে ঔষধদান করিয়াই নিশ্চিন্ত—বাণিজ্য ব্যবসায়ী ক্রয় বিক্রয় করিয়াই নিশ্চিন্ত—বিচারক কোনরূপে বিচারকার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত—ব্যবহারাজীব তর্কবিতর্ক করিয়াই নিশ্চিন্ত,—জ্ঞানচর্চ্চা কোন খানেই নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে যথার্থ কৃতবিদ্য লোক অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। স্মারকলিপি প্রায় কাহার নাই। অথচ এই সহজ উপায় দ্বারা আমরা অনেক আবশ্যকীয় বিষয় নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। যিনি যে কার্য্যে ব্যাপৃত, প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দর্শনফল লিপিবদ্ধ করেন—আপন আপন অর্থকরী কার্য্যের সহিত যে সকল বিষয়

সংযুক্ত, যদি সেই সকল বিষয়ক জ্ঞানলাভ চেষ্টা করেন—অনুসন্ধান করেন—তবে অনেক উপকার হইতে পারে। সেরূপ চেষ্টা দূরের কথা, অর্থকরী কার্য্যসম্বন্ধীয় ও সামাজিক ঘটনাসম্বন্ধীয় সামান্য কথাবার্ত্তা ব্যতীত, অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ক কথাবার্ত্তাও অনেকে বালকের ক্রীড়া মনে করেন। সংসারে যাঁহারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় তাঁহাদের সংস্পৃশ্য নহে। ইউরোপীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কথোপকথন ও পত্রাদি কি সুন্দর! বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহারা বাচনিক ও পত্রাদি দ্বারা কিরূপ নানা আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্যবিষয়ে কথোপকথন করিয়া থাকেন! সেই সকল পত্রে, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, কত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এদেশে তাহার কিছুই নাই! যথার্থ জ্ঞানানুশীলন কি পদার্থ, কি উপাদানে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ চরিত্র গঠিত হয়, অনেকে তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। সমাজমধ্যে তাঁহারাই বড়লোক রূপে পরিগণিত, যাঁহারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনে বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যথার্থ বড়লোকের অর্থ অন্য প্রকার। যদি অর্থোপার্জ্জনই জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে পরিগৃহীত হয়—কিছু লেখা পড়া শিখিয়া যাঁহারা অর্থ উপা-

র্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং খ্যাত হইয়াছিলেন, সেই সকল লোকের চরিত্রই যদি সমাজ মধ্যে আদর্শচরিত্ররূপে গৃহীত হয়—তবে আমরা দেশের চতুর্দ্দিকে যে হীনাবস্থা দেখিতেছি—জ্ঞান-দারিদ্র্য দেখিতেছি—তাহা বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু অর্থোপার্জ্জন জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; কারণ, অর্থোপার্জ্জন মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, তাহা জীবনধারণের একটী উপায় মাত্র। মানবজীবনের উদ্দেশ্যসাধন করা—নিয়তিপূর্ণ করাই জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব যখন মনের উৎকর্ষ-সাধন, চরিত্র-গঠন, সংসারের মঙ্গলসাধন জন্য জ্ঞানানুশীলনে রত হয়, তখনই তাহার জীবন ধন্য হয়। পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ নিস্পৃহ, অরণ্যবাসী হইয়াও সংসারের উন্নতিকামনায়, কত সত্য, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন! ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই যে, চারিদিকে শিক্ষাব্যাপ্তি হইতেছে—সংবাদপত্র প্রচার হইতেছে—রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছে—নাটক, উপন্যাস ও কবিতা বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, যে দেশ ষড়্‌দর্শনের জন্মভূমি—যে দেশ অতুল প্রতিভাশালী মহামহোপাধ্যায়-

গণের জন্মভূমি বলিয়া জগতে বিখ্যাত—সেই দেশীয় কোন ব্যক্তি এযাবৎ নিজ দেশের একখানি প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে সমর্থ হন নাই! দেশীয় ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান নাই—এক খানি উৎকৃষ্ট মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ নাই। স্বাভাবিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ত কথাই নাই, গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইউরোপীয়গণ এদেশে আগমন করিয়া, এদেশ সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া স্বদেশের বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি! আমরা কোন্ মহাপাপে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও গভীর চিন্তাশীলতায় বঞ্চিত হইয়াছি? আমরা কি কখন জাগরিত হইব না?—উদ্যম ও অধ্যবসায়সহকারে স্বাধীনভাবে, জ্ঞানানুশীলনে, সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইব না? ইংরাজী পুস্তকলব্ধজ্ঞানে আমরা কি চিরদিনই পরিতৃপ্ত থাকিব? ইউরোপীয়গণের ন্যায়—প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের ন্যায়—নূতন সত্য আবিষ্কারে—নূতন মত প্রবর্ত্তনে—নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে—স্বদেশের ও জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইব না? যতদিন তাহা না পারিব, ততদিন আমরা কখনই প্রকৃতরূপে উন্নত হইব না—হীনভাবেই জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে—জগতের উন্নতিশীল

জাতির সমিতি মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইব না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য গভীর উদ্যম, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন—ভোগবাসনা প্রশমিত করা প্রয়োজন। অগ্রসর হও—চেষ্টা কর—পূর্ণমনোরথ হইবে।

সময়ের ক্ষুদ্রাংশ।—সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলিকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে। সময়ের ক্ষুদ্রাংশ ও জীবনের ক্ষুদ্রাংশ অভেদ জ্ঞান করিবে। এক কার্য্যের সমাধান ও অপর কার্য্যের প্রারম্ভের মধ্যবর্ত্তী সময়াংশগুলিকে, অতি সামান্যজ্ঞানে তুমি প্রায় সর্ব্বদাই বৃথা অতিবাহিত হইতে দেও, কিন্তু ইহাতেই তোমার জীবনের এক গুরুতর অংশ বৃথা চলিয়া যায়। উন্নতিকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রত্যেক মুহূর্ত্তই মূল্যবান—মুহূর্ত্ত সংযোগেই প্রহর হইয়া থাকে। জগতে যে সকল মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন—মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন—জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই প্রায় মুহূর্ত্তের কৃপণতা করিয়াছেন। মুহূর্ত্ত-কৃপণতা ব্যতীত সময়-প্রচুরতা লাভ করা অসম্ভব।

অতএব, যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাও—সময়ের প্রচুরতা লাভ করিতে চাও—তবে সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রক্ষা কর;—দেখিবে ক্রমে

অনেক মাস ও বৎসর রক্ষা করিয়াছ। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন:—"জলবিন্দুপাতে ক্রমে ঘট পূর্ণ হয়।" বৃষ্টির জল বিন্দু বিন্দু পতিত হয়, তাহাই একত্রিত হইয়া বন্যারূপে দেশ প্লাবিত করে। যে বাষ্পরাশি তোমার সম্মুখে অদৃশ্যপ্রায় উড্ডীন হইতেছে, তাহাই একত্রিত ও ঘনীভূত হইয়া প্রবল শক্তি উৎপাদন করে; সেই শক্তিবলেই বাষ্পীয় কল চালিত হয়।

দুই কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়াংশের জন্য পৃথক পৃথক কার্য্য স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা সকল সময়, উপস্থিতমত, স্থির করা যায় না যে কিরূপে তাহাদিগকে কার্য্যে প্রয়োগ করা উচিত।

ইউরোপীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সময়ের ক্ষুদ্রাংশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি তাহার যথোচিত ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাহা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

কয়েকটী নিয়ম।—এক্ষণে যে তিনটী নিয়মের বিষয় বিবৃত হইতেছে, তাহা অতি সহজ এবং প্রায় সকলেই তাহা অবগত আছেন; কিন্তু কার্য্যকালে সে গুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং সেইজন্য

অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে সময়ের বিস্তর অপচয় নিবারিত হইবে, প্রচুরতা আসিবে এবং সকল কার্য্যই অপেক্ষাকৃত সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রম সম্বন্ধেই ইহা প্রয়োজ্য।

প্রথমতঃ। "তোমাকে যতগুলি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকের জন্য, তোমার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায়, সময় নিরূপিত করিবে। সময় নিরূপিত থাকিলে, অনিশ্চিততায়—কখন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, উপস্থিত কার্য্য এখন করা উচিত কি সময়ান্তরে, এই বিষয়ক মানসিক আন্দোলনে—যে সময় বৃথা অতিবাহিত হয়, তাহা রক্ষা করিতে পারিবে। আবার, এই নিয়ম দ্বারা, এক সময়ে নানা কার্য্য উপস্থিত হইয়া যে অসীম অপচয়, অসুবিধা ও চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করে, সম্পূর্ণরূপে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে। এই নিয়ম দ্বারাই বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ফলোপধায়ীরূপে ক্রমাগত পরিশ্রম করা সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই নিয়ম অধ্যবসায়ের জীবন স্বরূপ। অতএব কখন ইহাকে উপেক্ষা করিবে না।"

দ্বিতীয়তঃ। সময় নিরূপণ সম্পূর্ণরূপে ফলহীন, যদি নিরূপিত সময়ে প্রত্যেক কার্য্য করিতে যত্নবান না হও। প্রত্যেক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করার গুণ অপরিসীম। মানবজীবনে কখন কখন এরূপ সময় উপস্থিত হয়, যে ২।৪ মিনিটের মধ্যেই তাহার ভাবী মঙ্গল বা অমঙ্গল—সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের—সূত্রপাত হইয়া থাকে। ৫ মিনিট পূর্ব্বে যে কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ী হইত, এই অত্যল্প বিলম্বে তাহা বিফল হইল। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন একটী বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, হয়ত তোমার চরিত্র ও উন্নতির অবস্থা শুভাবহ হইত; সামান্য বিলম্বে মহান্ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। যে সকল পণ্ডিত জ্যোতিষ্কবর্গের গতি ইত্যাদি নিরূপণে রত থাকেন, সময়ে সময়ে তাঁহাদের দর্শন-ফল এক বিশেষ নিমিষের উপর নির্ভর করে। শত যুদ্ধে জয়ী সুবিখ্যাত ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট উপযুক্ত সময়ে কার্য্য সম্পাদনের নিতান্তই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সময়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি বলিতেন, কোন যুদ্ধ সমস্ত দিন চলিতে পারে, কিন্তু তাহার জয় পরাজয় প্রায়ই ৫।৭ মিনিটের মধ্যে নিরূপিত হইয়া থাকে। জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতা

লাভ করিয়াছেন, মহৎ ও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, এই মহোপকারী নিয়ম তাঁহাদের সকলেরই সহায় ছিল। অতএব কখন ইহাকে উপেক্ষা করিবে না।

তৃতীয়তঃ। যখন যে বিষয়ে ব্যাপৃত হইবে, তাহা ব্যবস্থা পূর্ব্বক করিবে। ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমের লাঘব হয় ও অপেক্ষাকৃত সহজে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়। প্রত্যেক কার্য্যেই, কোন্ অংশ অগ্রে কোন্ অংশ পরে সম্পাদন করা আবশ্যক—এক অংশের সহিত অন্য অংশের কিরূপ সম্বন্ধ—এক অংশের সহায়তায় অন্য অংশের কি সুবিধা হইতে পারে—কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে, কোন্ বিষয় সমাবেশিত করা উচিত—কোন প্রকার বুদ্ধি-কৌশলে তাহা অল্প আয়াসে সম্পন্ন হইতে পারে কি না,—এইরূপ নানা বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। সেই সকল বিষয় যথোচিতরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিলেই ব্যবস্থা পূর্ব্বক কার্য্য করা হয়। এতদ্দ্বারা বিস্তর অপচয় নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানলাভ—জ্ঞানরক্ষা—জ্ঞানপ্রয়োগ।—এই অধ্যায়ের উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, জ্ঞানানুশীলনে কখন শিথিল-যত্ন হইবে না। যেমন জগতের

চারিদিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ, সেইরূপ মানবমন উন্নতিশীল। কখনও যে তাহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে—জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষিত করিবে—এরূপ অনুমান করা দূরের কথা, আমরা এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না। তুমি যখন যে অবস্থায় পতিত, যত্নের সহিত, উদ্যমের সহিত, জ্ঞানানুশীলন কর—উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞানমণ্ডলে বিচরণ কর—আপনার নিয়তি পূর্ণ কর।

সম্পূর্ণ উদার, শান্ত ও অপক্ষপাত হৃদয়ে জ্ঞানাম্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। মধুমক্ষিকাগণ যেমন যে ফুলে মধু পায়, সেই ফুল হইতেই তাহা গ্রহণ করে, সেইরূপ যখন যেখানে সত্য পাইবে—যাহার নিকটে সত্য পাইবে—অবাধে, দেশ কাল পাত্র ভেদ না করিয়া, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিবে। ইহা জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। দীনতাপূর্ণ, অহঙ্কারশূন্য হৃদয়ে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত না হইলে কখন কৃতকার্য্য হইবে না। অহঙ্কার দৃষ্টিরোধ করিয়া দেয়, সুতরাং পতন অপরিহার্য্য। যতই সত্যলাভ করিবে ততই অভাব বোধ করিবে। তখন নিউটনের ন্যায় বলিবে:—"জ্ঞান সাগরের কূলে শিশুর ন্যায় উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" অন্যের উপার্জ্জিত জ্ঞান লাভ করিয়া কখন তৃপ্ত হইবে না—সর্ব্বদাই

নূতন অনাবিষ্কৃত সত্য লাভে যত্নবান হইবে। অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইবে।

শ্রমলব্ধজ্ঞান যত্নে রক্ষা করিবে। যাহাতে সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ ও কার্য্যকর হয়—জীবন আলোকিত করে—সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিবে। যে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রয়োগ করিতে না পার—কর্ত্তব্য সাধনে প্রয়োগ করিতে না পার—যদ্দ্বারা তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত না হয়—তাহাকে তোমার নিজ সম্পত্তি বলা যাইতে পারে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যেমন বিনা চালনায় হীনবল হয়, সেইরূপ বিনা চর্চ্চায় জ্ঞানও ক্ষীণ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে এবং মনের জড়তা উপস্থিত হয়। কেবল চর্চ্চা ও ব্যবহার দ্বারা তাহাকে সজীব রাখা যায়।

লব্ধজ্ঞান যেমন রক্ষা করিবে, তেমনি তাহাকে মনোমধ্যে যথাস্থানে সজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিবে। যেমন কোন গৃহের মধ্যে, নানা দ্রব্য বিশৃঙ্খলার সহিত স্থাপিত করিলে, দ্রব্য বিশেষের প্রয়োজন কালে, তাহা সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, জ্ঞান সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে সেইরূপ হইয়া থাকে।

আবার, যেমন ইচ্ছানুসারে সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় ও অপচয় হইতে পারে, সঞ্চিত জ্ঞান সম্বন্ধেও

সেইরূপ হইতে পারে। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য যথোচিতরূপে কর্ত্তব্যপালন। জ্ঞান যখন কর্ত্তব্যপালনের সহায় হয়—ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে প্রযুক্ত হয়—তখনই তাহার সদ্ব্যয় হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে তাহার অপচয়। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার অপচয় আছে। তাহা যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারই অঙ্গীভূত তথাপি তাহার পৃথক উল্লেখ প্রয়োজন। জ্ঞান যখন ফলোপধায়ী কার্য্যে প্রযুক্ত না হয়—এমন কার্য্যে প্রযুক্ত না হয়, যাহাতে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল অধিক হইয়া থাকে,—তখনও জ্ঞানের অপচয় হয়। অতএব কেবল জ্ঞানলাভ চেষ্টা করিলেই তোমার কার্য্য শেষ হইল না। তোমাকে যত্নের সহিত জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে—শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে এবং কর্ত্তব্যপালনে প্রয়োগ করিতে হইবে।
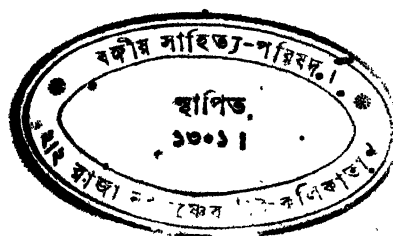
ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানসিক অপচয়—মনের স্বাস্থ্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শরীর মনে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরীর দুর্ব্বল হইলে মনও অসুস্থ ও দুর্ব্বল হয়। মস্তিষ্ক মনের প্রধান যন্ত্র স্বরূপ। স্নায়ুমণ্ডল ও পেশী মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহকারী। মস্তিষ্ক শরীরের অংশ। যে সকল স্বাভাবিক নিয়মে শরীর রক্ষিত, পালিত ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, সাধারণতঃ, মস্তিষ্কও সেই সকল নিয়মের অধীন। যে শোণিত দ্বারা শরীরের অপরাপর অঙ্গের পুষ্টিসাধন হয়, মস্তিষ্কও তদ্দ্বারা রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। দৃঢ়কায় সবল শরীরে প্রবল মন বাস করাই অধিক-তর সম্ভব। বস্তুতঃ যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা বুদ্ধিবলে জগতে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বলবান পুরুষ ছিলেন। রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইউরোপীয় অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত

প্রাপ্ত হওয়া যায়। শারীরিক অপচয় বিষয়ক প্রস্তাবে শারীরিক স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কয়েকটী নিয়ম বিবৃত হইবে। মানসিক স্বাস্থ্যের সহিত যে সকল বিষয়ের বিশেষ যোগ আছে, এ প্রস্তাবে তাহারই দু একটীর উল্লেখ করা হইবে।

মিতাচারিতা।—মনের স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য মিতাচারিতা নিতান্ত প্রয়োজন। অমিতাচারে মানসিক শক্তি সকল নিস্তেজ হয় এবং ক্রমে মনের কার্য্যকরী ক্ষমতা অদর্শন হয়। ইহা শারীরিক অপটুতারও এক প্রবল হেতু। মানসিক শক্তি সম্বন্ধে মাদকসেবন নিতান্ত অনিষ্টকারী; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বপ্রকার মাদকসেবন পরিহার করিবে। দুশ্চরিত্র মাদকাসক্ত ব্যক্তিগণের মানসিক অবস্থা পরিণামে প্রায়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। যাঁহারা মিতাচারী, ন্যায়পরায়ণ—যাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে স্বাভা-বিক নিয়ম পালন করিয়া থাকেন—তাঁহারাই শরীর মনের স্বাস্থ্য প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হন—তাঁহারাই জগতে মহৎ কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র।

বিশুদ্ধতা।—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কিছু মলিনতাপূর্ণ তাহাই মনের পক্ষে অসুখকর ও অস্বাস্থ্যকর।

শরীর বিশুদ্ধ রাখিলে, প্রশস্ত, পরিষ্কৃত, বায়ুসঞ্চারিত স্থানে বাস করিলে, মন প্রফুল্ল হয় এবং মনোবৃত্তিগণ সুচারুরূপে ক্রিয়াবান হয়। পক্ষান্তরে, মলিন দেহে, বায়ুহীন অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে, মনের অসুস্থতা উপস্থিত হয়—শরীর পীড়িত হয়। বাহ্যিক মলিনতায় মনের মলিনতা উৎপাদিত হইতে পারে। পবিত্রচরিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বাহ্যিক বিশুদ্ধতার অনুরাগী। অতএব মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ থাকিবে এবং পরিষ্কার বায়ুপ্রবাহিত স্থানে বাস করিবে।

মানসিক বিশ্রাম।—মনকে কদাচ গুরুভারে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে প্রপীড়িত করিও না। মনের কার্য্যকরী শক্তির সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করিলে অব্যাহতি নাই;—অচিরাৎ মনের বিকলতা উপস্থিত হইবে—তাহার উন্নতির গতিরোধ হইবে—স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে—অকর্ম্মণ্য হইয়া ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এক বিষয়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে বিরক্তি উপস্থিত হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং উপস্থিত কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সুতরাং মনকে নিয়মিতরূপে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। যেমন পরিশ্রমের সময় নিরূপিত করিবে, সেইরূপ বিশ্রামের কালও

নির্দ্ধারিত করিবে। এক বিষয়ে ক্রমাগত পরিশ্রম নিবারণ জন্য, সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায়, প্রতিদিন পৃথক পৃথক সময়ে তিন চারিটী পৃথক পৃথক কার্য্যে মন নিয়োজিত করা যাইতে পারে; এবং দুইটী পৃথক কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম অথবা শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ মানসিক পরিশ্রমের পর কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম সুখকর ও স্বাস্থ্যকর। মানসিক বিশ্রামের পক্ষে নিদ্রা বিশেষ উপযোগী। নিদ্রাকাল খর্ব্ব করিয়া কদাচ মানসিক পরিশ্রমে ব্যাপৃত হইও না। নিদ্রাকাল খর্ব্ব করায় অচিরাৎ স্বাস্থ্যনাশ হয়।

দুর্ভাবনা।—দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যনাশের একটী প্রবল কারণ। ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় মানসিক শক্তি সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, উন্নতির গতিরোধ হয় এবং শোণিত দূষিত ও শরীর নানা রোগের আধার হইয়া উঠে। সাধারণতঃ, সাংসারিক দুরবস্থা বশতঃ, কখন কখন কোন বিশেষ হেতুবশতঃ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে কাল্পনিক বিপদ-চিত্র দুশ্চিন্তাবেগ দ্বিগুণিত করে। দীর্ঘকাল দুশ্চিন্তাপীড়িত হইলে সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায় প্রভৃতি তিরোহিত এবং এক প্রকার মানসিক রোগ·

আবির্ভূত হয়। সেই অবস্থায় মন সর্ব্বদা বিষাদ-পূর্ণ বা শোকসূচক কাল্পনিক চিত্রে বিচরণ করে, বুঝাইয়া দিলেও তাহার অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না, জীবন নিরানন্দ এবং ক্লেশময় হইয়া থাকে।

কিন্তু দুশ্চিন্তা প্রতিকূল অবস্থা বা বিপদ অতি-ক্রম করিবার উপায় নহে। যতই দুশ্চিন্তা প্রবল-তর হয়, অব্যাহতি-লাভ ততই দূরতর হইয়া পড়ে। অবস্থা-সংগ্রাম বা দৈব-দুর্ঘটনায় যেরূপ সহিষ্ণুতা, মনস্থিরতা ও সাহসের প্রয়োজন, বোধ হয় সেরূপ আর কিছুতেই নহে। যখন প্রতিকূল অবস্থা বা বিপদে আচ্ছন্ন হইবে, অথবা অন্য যে কোন কারণে দুশ্চিন্তাপীড়িত হইবে, আত্মশাসন প্রভাবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার চেষ্টা করিবে, মনের ভাব গোপন না রাখিয়া বিশ্বাসী, সহানুভূতিদাতা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিবে, মনঃস্থির করিয়া সাহস ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, অব্যাহতি-লাভ জন্য পরিশ্রম করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরমে-শ্বরের উপর নির্ভর করিবে। ইহাই অব্যাহতি লাভের উপায়।

আমোদ প্রমোদ।—মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য মধ্যে মধ্যে রুচি অনুযায়ী নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে

মনকে আনন্দিত করা আবশ্যক। একজন ইউ-রোপীয় পণ্ডিত (হার্বার্ট স্পেন্সার) বলিয়াছেন যে, মনের বলোৎপাদনকারী ঔষধির মধ্যে সুখই সর্ব্ব-প্রধান। অতএব মনকে সর্ব্বদা সুখী রাখিতে যত্নবান হইবে। যে সকল ক্রীড়ায় শারীরিক পরি-শ্রমের সহিত আনন্দলাভ করা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষা জন্য সেই সকল ক্রীড়াই প্রশস্ত।

সঙ্গীত।—সঙ্গীত মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের দেশে অত্যন্ত অব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সঙ্গীতের এমনি হীনাবস্থা হইয়াছিল যে, সামাজিক মনে তাহার সহিত যেন একটা দূষিত, দুর্নীতিময় ভাব জড়িত ছিল। উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের অভাব ছিল না। রামপ্রসাদ, "দেওয়ান মহাশয়" প্রভৃতি অতি বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে উত্তম উত্তম সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনের উৎকর্ষসাধন, মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সুনীতি সঞ্চার উদ্দেশে, সাধারণে সঙ্গীত-চর্চ্চা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্গীতবিশারদ রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীতকে সেই দূষিত ভাব হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক করিয়াছেন। তথাপি এখনও মনের উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য

গৃহে গৃহে সঙ্গীতের চর্চ্চা নাই। কিরূপে হইবে? ভদ্রমহিলাগণের পক্ষে সঙ্গীত এখনও স্পর্শনীয় পদার্থ-রূপে পরিগণিত হয় নাই। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচুর সমাদর এবং তাহা শিক্ষণীয় বিষয়।

ভ্রমণ।—মধ্যে মধ্যে স্থানপরিবর্ত্তন ও মনোহর শোভাযুক্ত স্থানে ভ্রমণ, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। এক বিষয় পুনঃ পুনঃ দেখিয়া মনের এক প্রকার বিরক্তি উপস্থিত হয়, পর্য্যবেক্ষণ উত্তমরূপে ক্রিয়াবান হয় না। নূতন নূতন দৃশ্য দর্শনে মন আনন্দিত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় এবং বায়ুপরিবর্ত্তন বশতঃ শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ ও মনের সবলতা সাধন হয়। কেবল ইহাই নহে। ভ্রমণ বহুদর্শিতা-লাভ ও মনের উৎকর্ষসাধনেরও একটী সুন্দর উপায়। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলে, সহস্র সহস্র নূতন ব্যাপার, নানাজাতীয় লোক, তাহাদের আচার ব্যবহার, ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়নগোচর হয়, সুতরাং জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিক ও শিল্পরচিত নানাবিধ বস্তু দর্শন করিয়া শোভানুভাবকতা-শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যে মনে শোভানুভাবকতা বিকাশিত হয় নাই, তাহা এখন নিদ্রিত বলিলেই হয়। এসম্বন্ধে ইউরোপে একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে।

সেখানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্য সমাধানের পরে ভদ্র-সন্তানগণ দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত। এতদ্দ্বারা পুস্তকলব্ধজ্ঞান বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হয়, পর্য্যবেক্ষণ প্রখর হয় এবং মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। এদেশে তাহার কিছুই নাই। যাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল, তাঁহাদিগকেও শিক্ষালাভ বা মানসিক স্বাস্থ্যলাভ উদ্দেশে দেশ-ভ্রমণে রত দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি ক্ষীণ হইবে, অকালে মনোদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কোন কোন ব্যক্তি পীড়িত অবস্থায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু নীরোগ শরীরে তাহা করিলে হয়ত পীড়া-যাতনা ভোগ করিতে হইত না। অনেকে একার্য্যে অর্থব্যয় অপচয় মনে করেন; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সর্ব্ব-প্রকার অপচয় নিবারণের একটী উপায়।

কথোপকথন।—বন্ধু বান্ধবের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটী সুন্দর উপায়। যাঁহাদের সহিত মানসিক সৌসাদৃশ্য ও হৃদয়ের সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের সহিত মানসিকভাব-বিনিময় অতীব সুখকর ব্যাপার। ইহাতে যে কেবল বিশ্রামকাল সুখে অতিবাহিত হয়-

এমন নহে, পরন্তু এতদ্দ্বারা নানা বিষয়ে মনের উন্নতি ও বহুদর্শিতা লাভ হইতে পারে। জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথনে অতি সহজে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিতে পারা যায়। এমন কি যদি তোমার চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, তবে সামান্য লোকের সহিত কথোপকথনেও জ্ঞানলাভ অসম্ভব নহে। সর্ব্বদাই দেখিবে যে অতি সামান্য মূর্খ ব্যক্তিও এমন অনেক বিষয় অবগত আছে যাহা তুমি জান না। সামান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ কিরূপে জীবনধারণ করে, চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাহাদের মত কি, তাহাদের মধ্যে কিরূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত, কিরূপ প্রণালীতে তাহারা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে, ইত্যাদি সহস্র বিষয়ে তুমি তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিতে পার। যখন উৎকৃষ্টতর উপায় উপস্থিত নাই, তখন কৃষকের সহিত গল্প করিয়াও মনকে প্রফুল্ল ও কিছু শিক্ষা করিতে পার।

শিশুগণের সহিত ক্রীড়া।—শিশুগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুক মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটী সুখকর উপায়। ইহা যে কিরূপ মনস্তুষ্টিকর কার্য্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যিনি কখন দুশ্চিন্তা-

পীড়িত অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাত আছেন যে এতদ্দ্বারা মনের উপর কিরূপ স্নিগ্ধকর জ্যোতিঃ পতিত হয়। বালকহৃদয় স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও আনন্দ-ময় এবং অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ। এখনও সেখানে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। তাহাদের সহিত একটু সহানুভূতি প্রকাশ কর, তাহাদিগকে একটু ভালবাসা দেও, অমনি কিশোর মন বিগলিত হইবে—তোমার অনুরক্ত হইবে—তোমার উপর অজস্র প্রেমধারা বর্ষণ করিবে। ইহা যে কেবল আনন্দজনক ব্যাপার এমন নহে, ইহা শিক্ষালাভের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। কিরূপে বালকের মন বিকাশিত হইতেছে, একটী একটী করিয়া নানা বিষয়ক সংস্কার জন্মিতেছে; তাহা মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করা গভীর জ্ঞানলাভের উপায়। দশখানি মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পাঠে যে ফললাভ না হয়, একটী শিশুর মনের বিকাশ পূর্ব্বাপর পর্য্যবেক্ষণ করিলে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান-লাভ হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

শারীরিক অপচয়—স্বাস্থ্যবিধান।

স্বাভাবিক নিয়ম পালন।—শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ না থাকিলে, কি শারীরিক, কি মানসিক, কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। জীবন ধারণ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য উভয় প্রকার পরিশ্রম প্রয়োজন।

মানবদেহ যে সকল স্বাভাবিক নিয়মের অধীন, সেই সকল নিয়ম যথাবিধানে পালন না করিলে, শরীর নানা রোগপীড়িত ও শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা অচিরাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম অমোঘ—কিছুতেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার যো নাই। যখনই ভঙ্গ করিবে, তখনই শারীরিক অমঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। কোন বিশেষ নিয়ম ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবী অপকারিতা অনুভব কর বা না কর, ইহা নিশ্চয় যে, তাহার অমঙ্গলময় বীজ অচিরাৎ শরীরে নিহিত হইবে, সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া অসীম অশুভ ফল উৎপাদন করিবে। এমন কি সেই অমঙ্গল বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

স্বাভাবিক নিয়মভঙ্গে প্রভূত পরিমাণে শারীরিক অপচয় হইয়া থাকে। সুতরাং, শারীরিক অপচয় নিবারণ করিতে হইলে, সেই সকল স্বাভাবিক নিয়ম অবগত হইয়া, যথাবিধানে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। সেই সকল নিয়মের সম্যক পর্য্যালোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে এবং স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা দ্বারা, পাঠক এ বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন। এখানে আমরা দুই চারিটী মুখ্য বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।

জীবন ধারণের সাধারণ নিয়ম।—মানবদেহে অবিরামে, পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত উৎপাদন, রক্ত সঞ্চালন, শরীর পরিপোষণ, ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। সেই সকল ক্রিয়াবশতঃই আমরা জীবিত আছি। সেই সকল ক্রিয়া রোধ হওয়া বা মৃত্যু একই কথা। এই সকল ক্রিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর উপর শ্বাস-ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে; জল ও শস্যাদির উপর পান ও আহার নির্ভর করিতেছে; বাহ্যিক উত্তাপ, শীত-লতা, আলোক, ইত্যাদির উপর দৈহিক ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে; ইত্যাদি।

৮ যদি জল বায়ু দূষিত হয়, শস্যাদির অভাব হয়, উত্তাপ ও শীতলতার অস্বাভাবিক প্রবলতা বা ক্ষীণতা উপস্থিত হয়, তবে জীবনধারণ ক্লেশকর বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার, যদি দৈহিক ক্রিয়া চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যিক অবস্থার উপযোগী না হয়—শীতের প্রবলতায় যে পরিমাণে আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রয়োজন, শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা যদি তাহা সংসাধিত না হয়; চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যিক অবস্থার সহিত তুল রক্ষা করিবার জন্য যে পরিমাণে আহার গ্রহণ আবশ্যক, যদি দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা জীর্ণ না হয়, যে পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসযন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা যদি গ্রহণ করিতে না পারা যায়, —তাহা হইলেও জীবনধারণ ক্লেশকর বা অসম্ভব হয়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্যিক অবস্থার সহিত দৈহিক ক্রিয়ার পরস্পর উপযোগিতা ও তুল রক্ষার উপর জীবন রক্ষা নির্ভর করিতেছে। এই উপযোগিতা ও তুলরক্ষা উদ্দেশেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অপরাপর সমস্ত নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

দৈহিক ক্রিয়া।—দেহের অভ্যন্তরে ক্রমাগত ক্ষয় ও উৎপাদন ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। পুরাতন

পরমাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—নূতন পরমাণু গঠিত হইতেছে। আমরা প্রতিদিন আহার গ্রহণ করিতেছি,—পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা নূতন রক্ত প্রস্তুত হইতেছে—তাহা দেহের সমস্ত অংশে পরিচালিত হইতেছে—তাহা দ্বারাই নূতন পরমাণু গঠিত হইতেছে—সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টতা সাধিত হইতেছে—পুনরায় তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে—পুনরায় নূতন শোণিত প্রস্তুত হইতেছে।

পরিপাক।—আমাদের আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে কতকগুলি তরল ও কতকগুলি কঠিন পদার্থ। কঠিন দ্রব্য প্রথমতঃ দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত হয়। সেই সময়ে লালা নামক এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া তাহার সহিত মিশিত হয়। চর্ব্বিত লালা-মিশ্রিত খাদ্য কণ্ঠনলী পথে উদরস্থ হয়। লালা-রস দ্বারা মণ্ডযুক্ত আহার্য্য (starch) এক প্রকার চিনিতে পরিণত হইয়া দ্রবীভূত হয়। খাদ্য উদরে প্রবেশ মাত্র উদরের ক্রিয়া আরম্ভ হয়—খাদ্য বিলোড়িত হইতে থাকে। এই সময়ে উদরনিঃসৃত এক প্রকার রস (gastric juice বা পাচক রস) তাহার সহিত মিলিত হয়। এই রস এক প্রকার অম্ল (hydrochloric acid) ও পেপ্‌সিন নামক পদার্থ মিশ্রিত। এক্ষণে এই রস সংযোগে, উদরস্থ নাইট্রোজনযুক্ত

যা মাংসোৎপাদক খাদ্য দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই সময়ে ঐ দ্রবীভূত পদার্থ উদরের অভ্যন্তরস্থ কোমল চর্ম্ম বা ঝিল্লি দ্বারা শোষিত হইয়া শিরা (vein) প্রবাহিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। এই ক্রিয়া উপরস্থ উদরে সাধিত হয়।

অতঃপর, অবশিষ্ট চূর্ণীকৃত খাদ্য নিম্নস্থ উদরে বা তলপেটে চালিত হয়। সেখানে কয়েক হস্ত পরিমিত লম্বা একটী চর্ম্মময় থলী আছে (যাহাকে অন্ত্র বা আঁত বলা হয়)। সেই থলীর অভ্যন্তরে এক্ষণে পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। উদরের নিম্ন দেশস্থিত ক্লোম (pancreas) নামক গ্রন্থি (gland) হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। যকৃৎ হইতে পিত্তরস নির্গত হয়। এই উভয় প্রকার রস উল্লিখিত চর্ম্মময় থলীর অভ্যন্তরস্থ খাদ্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে পরিপাক করে। সর্ব্বপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ এই উভয় রস সংযোগে পরিপাক হয়। যে খাদ্য লালা, পাচক রস বা পিত্ত দ্বারা পরিপাক না হইয়া অবশিষ্ট থাকে, ক্লোমরসযোগে তাহা পরিপাক হয়। উক্ত থলীর অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শোষক শিরা আছে, তদ্দ্বারা উল্লিখিত খাদ্যের দ্রবীভূত অংশ শোষিত হইয়া শিরা-প্রবাহিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। অবশিষ্টাংশ মল-

রূপে দেহ-বহিষ্কৃত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত দৈহিক ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে।

রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাস।—দেহের অভ্যন্তরে অবিরামে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। এই ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত কৌশলে সম্পাদিত যে, তাহা অবগত হওয়া অপার আনন্দের বিষয়। এই ব্যাপারে বিশ্বনিয়ন্তার অসীম জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র। ইহার গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার। হৃৎপিণ্ড, প্রথমতঃ, লম্বভাবে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; বাম ও দক্ষিণ ভাগ। ইহাকে দুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ বলা যাইতে পারে। পেশীরূপ দেয়াল দ্বারা এই উভয় প্রকোষ্ঠ বিভাজিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন পথ নাই, সুতরাং রক্ত গমনাগমন করিতে পারে না। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ আবার দুই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত,—বাম ভাগের উপরস্থ ও অধঃস্থ প্রকোষ্ঠ এবং দক্ষিণ ভাগের উপরস্থ ও অধঃস্থ প্রকোষ্ঠ। উপরস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে অধঃস্থ প্রকোষ্ঠে রক্ত আসিতে পারে, কিন্তু অধঃস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে উপরস্থ প্রকোষ্ঠে যাইতে পারে না। রক্ত নিম্ন প্রকোষ্ঠে পতিত হইবামাত্র, একটী চর্ম্মের পরদা (কপাট) পথরোধ করিয়া দেয়, এজন্য তাহা

আর উপরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না।

দেহাভ্যন্তরে রক্ত প্রবাহের দুই প্রকার পথ আছে। প্রথম, আর্টারি বা ধমনী, দ্বিতীয়, ভেন বা শিরা। ধমনী ও শিরা রক্ত প্রবাহের নল বিশেষ। হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীপথে রক্ত প্রবাহিত হয়। সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ করিয়া সেই রক্ত শিরাপথে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাগত হয়। ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার সহিত উদরস্থ খাদ্যরস মিলিত হয়। কিরূপে এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়, একটু মনোযোগের সহিত তাহা দেখা আবশ্যক।

কলিকাতা নগরে কলের জল যেরূপে নলের ভিতর দিয়া চালিত হয়—প্রথমে বৃহৎ নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ক্ষুদ্রতর নলে চালিত হয়, অবশেষে ক্ষুদ্রতম নলের মধ্য দিয়া লোকের গৃহে প্রবিষ্ট হয়,—অনেক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াও সেইরূপে সাধিত হয়। হৃৎপিণ্ডের বাম ভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে এওয়ার্টা নামক বৃহৎ ধমনী-পথে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ কতকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শাখা এওয়ার্টা ধমনী-দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ঐ ধমনী দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—প্রত্যেক শাখা

পুনরায় দুই প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপে এওয়ার্টা এবং তাহার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শাখা সমূহ দেহের সর্ব্বাংশে অসংখ্য প্রশাখা ও উপশাখা বিস্তার করিয়াছে এবং তাহাদের অভ্যন্তরে ক্রমাগত রক্ত পরিচালিত হইতেছে। এই সকল প্রশাখা ও উপ-শাখা ক্রমে বিভাজিত হইয়া সূক্ষ্মতম নাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের নাম ক্যাপিলারী বা কৈশিকানাড়ী, অর্থাৎ কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী। কিন্তু বস্তুতঃ, কৈশিকা নাড়ীগণ কেশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। এই সকল কৈশিকানাড়ী পরস্পর সংযোগে জালের আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ধমনীর অগ্রভাগে এইরূপে জাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ নাড়ী-জাল দেহের সর্ব্বাংশেই বিদ্য-মান আছে।

রক্তের প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়া ঠিক ইহার বিপরীত। ধমনীর ন্যায় শিরাও পুনঃপুনঃ বিভাজিত হইয়া, দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। শিরার শাখা প্রশাখাও কৈশিকা নাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। শিরার কৈশিকা নাড়ীর মুখ ধমনীর কৈশিকা নাড়ীর মুখের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই উপায়ে ধমনীর কৈশিকা নাড়ীর রক্ত শিরার কৈশিকা নাড়ী মধ্যে প্রবেশ করে।

দুইটী কৈশিকা নাড়ী একত্রে মিলিত হইয়া একটী বৃহত্তর নল উৎপাদিত হয়; ইহার নাম ভেন বা শিরা। দুইটী ক্ষুদ্র শিরা একত্রে মিলিত হইয়া একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিরা নির্ম্মিত হয়। এইরূপে শিরার সংখ্যা যত অল্প হয়, তাহাদের আকার তত বৃহত্তর হইতে থাকে। অবশেষে, দুইটী প্রধান শিরাপথে, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণভাগের উপরস্থ প্রকোষ্ঠে, দেহ-সঞ্চারিত রক্ত খাদ্যরসের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যাগত হয়। যে রক্ত ধমনীপথে হৃৎপিণ্ড হইতে প্রবাহিত হয় তাহা বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, লালবর্ণ, সবল রক্ত। তদ্দ্বারা দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টতা সাধন হয়। কিন্তু যে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাগত হয়, তাহা দুর্ব্বল, মলিন, কৃষ্ণবর্ণ রক্ত। প্রথমে তাহাতে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, দেহভ্রমণে তাহার অনেকাংশ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে দূষিত পদার্থ মিলিত হয়। আবার দেহভ্রমণে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে পরিমাণে ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে তাহার পূরণ হওয়া আবশ্যক, এবং পুনরায় দেহভ্রমণের উপযোগী করিবার জন্য তাহাকে বিশুদ্ধীকৃত করা আবশ্যক; নতুবা অচিরাৎ মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কি উপায়ে এই অত্যাবশ্যক কার্য্য সাধিত হয়, এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহ ভ্রমণ করিয়া যখন রক্ত ভেন পথে হৃৎপিণ্ডাভিমুখে প্রত্যাগমন করে, তখন উদরস্থ খাদ্যরস তাহার সহিত মিলিত হয়। এই উপায়ে উল্লিখিত ক্ষতি পূরণ হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, দুইটী বৃহৎ শিরাপথে দেহ-সঞ্চারিত রক্ত, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের উপরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠে পতিত হইবার অব্যবহিত পরেই তাহা দক্ষিণ ভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠে চালিত হয়। নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে তাহা পল্‌মোনারী আর্টরি নামক ধমনীপথে শ্বাসযন্ত্রে প্রবাহিত হয়। শ্বাসযন্ত্রে বিশুদ্ধীকৃত হইয়া, পুনরায় পল্‌মোনারী ভেন্‌স নামক শিরাপথে, হৃৎপিণ্ডের বামভাগের উপরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগত হয়; তথা হইতে বামভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠে চালিত হয়। সেখান হইতে, যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এওয়ার্টা নামক ধমনীপথে, দেহ ভ্রমণার্থ প্রবাহিত হয়।

রক্তশুদ্ধি।—এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে শ্বাস-যন্ত্রে কি প্রকারে রক্ত বিশুদ্ধীকৃত হয়। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা ট্রেকিয়া নামক বায়ুনলী পথে শ্বাসযন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। ঐ নলী ক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের অগ্রভাগ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বায়ুস্থলীতে

পরিণত হইয়াছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে পল্‌মোনারি আর্টরি নামক ধমনী দ্বারা রক্ত শ্বাসযন্ত্রে চালিত হয়। ঐ ধমনী ক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ক্যাপিলারিতে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল ক্যাপিলারি শ্বাসযন্ত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুস্থলীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। রক্তের সহিত যে অক্সিজন গ্যাস (অম্লজান) মিশ্রিত থাকে, দেহ ভ্রমণে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহার স্থানে কারবোণিক আসিড্ গ্যাস (অঙ্গারজান) মিলিত হইতে থাকে। এজন্য ঐ রক্ত দুর্ব্বল ও দূষিত হয়। সুতরাং পল্‌মোনারি আর্টরি নামক ধমনীপথে যে রক্ত শ্বাসযন্ত্রে চালিত হয়, তাহা দূষিত রক্ত। নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু শ্বাস-যন্ত্রে প্রবেশ করে তাহা বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ুতে দশ সহস্র ভাগের মধ্যে প্রায় ২১০০ ভাগ অক্সিজন গ্যাস এবং ৩ ভাগ মাত্র কারবোণিক আসিড্ গ্যাস মিলিত থাকে। পল্‌মোনারি আর্টরির অসংখ্য ক্যাপিলারি দূষিত রক্তপূর্ণ, এবং শ্বাসযন্ত্রের অসংখ্য বায়ুস্থলী বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ। যদিও ক্যাপিলারি ও বায়ুস্থলী উভয়ই সূক্ষ্ম চর্ম্মাবৃত, তথাপি ক্যাপিলারির অভ্যন্তরস্থ কারবোণিক

আসিড্ গ্যাস বায়ুস্থলীতে প্রবিষ্ট হয় এবং বায়ু-স্থলীর বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজন গ্যাস কৈশিকানাড়ী বা ক্যাপিলারিতে প্রবিষ্ট হয়। সেই সূক্ষ্ম চর্ম্ম গ্যাসের গতিরোধ করে না। পরস্পর মিলিত হওয়া গ্যাসের ধর্ম্ম। এই বিচিত্র উপায়ে মলিন কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বিশুদ্ধীকৃত হইয়া উজ্জ্বল লালবর্ণে পরিণত হয়। আমরা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু পরি-ত্যাগ করি তাহা দূষিত বায়ু, কারণ তাহা রক্তস্থ কারবোণিক আসিড্ গ্যাস মিলিত হইয়া বহির্গত হয়। এই পরিত্যক্ত বায়ুতে ১৬৫০ ভাগ মাত্র অক্সিজন এবং ৪৫০ ভাগ কারবোণিক আসিড্ গ্যাস মিলিত থাকে।

পল্মোনারি ধমনীর ক্যাপিলারিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা উৎপাদন করে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা মিলিত হইয়া বৃহত্তর শিরা গঠিত হয়; শিরার সংখ্যা যতই অল্প হইতে থাকে, তাহাদের আকার ততই বৰ্দ্ধিত হয়। অবশেষে পল্মোনারি ভেন্স্ নামক চারিটী বৃহৎ শিরাপথে, ঐ বিশুদ্ধীকৃত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বামি ভাগের উপরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগত হয়। তথা হইতে নিম্ন প্রকোষ্ঠে চালিত হইয়া, এওয়ারটা ধমনীপথে দেহ ভ্রমণে বহির্গত হয়।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড একটী বৃহৎ পেশী। তাহা ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। যে সময়ে শরীর-প্রবাহিত রক্ত, শিরাপথে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগস্থ উপরের প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগত হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে, বাম ভাগস্থ উপরের প্রকোষ্ঠে শ্বাস-যন্ত্র-প্রত্যাগত রক্ত পতিত হইতেছে। রক্ত পতিত হইবামাত্র, বাম ও দক্ষিণ ভাগস্থ উপরের প্রকোষ্ঠদ্বয়, ঠিক এক সময়ে, সঙ্কুচিত হইতেছে। সঙ্কোচনবশতঃ তৎক্ষণাৎ সেই রক্ত উভয় ভাগস্থ নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়ে চালিত হইতেছে,—দক্ষিণভাগের উপর প্রকোষ্ঠের রক্ত ঐ দিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠে এবং বাম ভাগের উপর প্রকোষ্ঠের রক্ত ঐদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠে। যেমন রক্ত নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়ে পতিত হইতেছে, অমনি তাহা সঙ্কুচিত হইতেছে, এবং ঠিক এই সময়ে, অতি বিচিত্র নিয়মে, উপর প্রকোষ্ঠ-দ্বয় হইতে নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়ে রক্তপ্রবাহের যে পথ আছে, তাহা চর্ম্মময় পরদা বা কবাট দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং রক্ত উপরের প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ বাম-ভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে এওয়ার্টা ধমনীপথে ও দক্ষিণভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে পল্‌মোনারি শিরাপথে চালিত হয়। যেমন নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়

সঙ্কুচিত অমনি উপরি প্রকোষ্ঠদ্বয় প্রসারিত হইতেছে। আমরা বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিলে এবং হস্তস্থ নাড়ী টিপিলে যে "দপদপানি" অনুভব করিয়া থাকি, তাহা হৃৎপিণ্ডের উল্লিখিত ক্রিয়া বশতঃ।

মানসিক ক্রিয়া ও হৃৎপিণ্ড।—পেশীর ক্রিয়া অনেক সময়েই আমাদের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে। যদি তাহা হইত, তবে জীবন ধারণ নিতান্তই ক্লেশকর হইত সন্দেহ নাই। কারণ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবিরামে সাধিত হওয়া আবশ্যক। যদিও ইচ্ছাধীন নহে, তথাপি, মানসিক ক্রিয়া দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। প্রবল উৎসাহে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবান, ও নিরাশায়, নিৰ্জ্জীবতায় ক্ষীণগতি হইয়া থাকে। দৈহিক পরিশ্রমে যে রক্তের গতি প্রবল হয় ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

কারবোণিক আসিড্ গ্যাস (অঙ্গারজান)। দৈহিক শক্তি ও উত্তাপ।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহ ভ্রমণে রক্তস্থ অক্সিজন গ্যাসের মাত্রা হ্রাস হয় এবং তাহার স্থানে কারবোণিক আসিড গ্যাস মিলিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, দেহাভ্যন্তরে কি কারণে ও কোন উপায়ে অক্সি-

জন গ্যাস ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও কারবোণিক আসিড্ গ্যাস প্রস্তুত হয়? ইহা জ্ঞাত আছ যে, দেহ সর্ব্বক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে উষ্ণ থাকে। দেহের আভ্যন্তরিক উত্তাপ বশতঃ এই উষ্ণতা অনুভূত হয়। মৃত দেহে উত্তাপ বা রক্তের গতি কিছুই থাকে না। এই আভ্যন্তরিক উত্তাপই জীবনী শক্তি স্বরূপ। কিরূপে এই উত্তাপ উৎপাদিত হয়? দেহের অভ্যন্তরে অবিরামে নির্ম্মাণ ও ধ্বংস কার্য্য সাধিত হইতেছে। পুরাতন পরমাণু ধ্বংস ও নূতন পরমাণু গঠিত হইতেছে। জীবন রক্ষার জন্য এই উভয় প্রক্রিয়াই নিতান্ত প্রয়োজন।

আমরা আহারের সহিত হাইড্রোজন ও কারবণ্ নামক পদার্থদ্বয় গ্রহণ করিয়া থাকি; তাহা রক্তের সহিত মিলিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধমনীর কৈশিকা নাড়ীজাল দেহের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কৈশিকা নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ রক্ত ক্রমাগত দৈহিক বিধান * দ্বারা পরিশোষিত

---

* দেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মতম আণুবীক্ষণিক পদার্থ, যদ্দ্বারা পেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ দৈহিক পদার্থ গঠিত হয়, তাহাকে বিধান কহে। ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট বিধান দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গঠিত হয়। ইহা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর নহে। একমাত্র শোণিত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিধান পরিপোষিত হয়।

হইতেছে। সেই রক্তস্থ হাইড্রোজন্ ও কারবণ্ সংযোগে নূতন বিধান গঠিত হইতেছে। নিশ্বাসের সহিত আমরা অক্সিজন্ (অম্লজান) গ্রহণ করিয়া থাকি; শ্বাসযন্ত্রে তাহা রক্তের সহিত মিলিত হয়। এই অক্সিজন্, বিধানস্থ হাইড্রোজন্ ও কারবণের সহিত মিলিত হয়। এতদ্দ্বারা এক প্রকার দাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে দৈহিক উত্তাপ উৎ-পাদিত হয়। এই দাহকার্য্য দ্বারাই পুরাতন বিধান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা জল ও কার-বোণিক্ আসিড্ গ্যাস প্রস্তুত হয়। ঐ গ্যাস রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং প্রশ্বাসের সহিত দেহ-বহিষ্কৃত হইয়া যায়।

আহার।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আহার গ্রহণ দ্বারা দেহমধ্যে নূতন রক্ত উৎপাদিত হয় এবং তদ্দ্বারা দৈহিকক্রিয়া জনিত ক্ষয় পূরণ হয়। সুতরাং আহার ব্যতীত অল্প কালেই শরীর নাশ হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অক্সিজন্ (অম্লজান), হাইড্রোজন (উদ্জান), নাই-ট্রোজন (যবক্ষারজান), কারবণ্ (অঙ্গার) এবং কিয়ৎ পরিমাণে ধাতব দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন সংযোগে মানব-দেহ গঠিত। সুতরাং দেহরক্ষার জন্য ঐ সকল

পদার্থের প্রয়োজন। আমাদিগকে আহারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রতিদিন ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিতে হয়। আহার্য্য সামগ্রীতেও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়।

যে সকল খাদ্যে কারবণ্, হাইড্রোজন্ এবং অক্সিজনের সহিত নাইট্রোজন মিলিত থাকে, সেই সকল খাদ্যদ্বারা, শরীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিধানের পরিবর্ত্তে নূতন বিধান (tissue) নির্ম্মিত হয়; এজন্য এরূপ খাদ্যকে নাইট্রোজনযুক্ত বা "মাংস-উৎপাদক" খাদ্য বলা যাইতে পারে। যে খাদ্যে নাইট্রোজন ব্যতীত অপরাপর পদার্থের সহিত কারবণ মিশ্রিত থাকে, তাহাকে কারবণযুক্ত বা "উত্তাপ-উৎপাদক" খাদ্য বলা যাইতে পারে। তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি এই শ্রেণীর খাদ্য। এতদ্ব্যতীত, জল এবং ধাতব দ্রব্য (লবণ প্রভৃতি) অপর এক শ্রেণীর খাদ্য। আমিষ ও উদ্ভিদ্, উভয় প্রকার বস্তুতেই "মাংস-উৎপাদক" ও "উত্তাপ-উৎপাদক" পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। মণ্ডযুক্ত খাদ্যে "উত্তাপ-উৎপাদক" পদার্থ অধিক পরিমাণে মিলিত থাকে। শরীরে, "মাংস-উৎপাদক" পদার্থ অপেক্ষা "উত্তাপ-উৎপাদক" পদার্থের অধিক প্রয়োজন হয়। বোধ হয় এই জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা উত্তাপ-উৎপাদনকারী নানা দ্রব্যের আস্বাদ মধুর করিয়াছেন।

দৈহিক ক্রিয়ার জন্য প্রতিদিন ৪ হাজার গ্রেণ কারবণ ও ৩ শত গ্রেণ মাত্র নাইট্রোজন আবশ্যক হয়।

বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত রাসায়নিক, ডাক্তার কানাইলাল দে, রায় বাহাদুর, F. C. S., F. S. Sc., C. I. E., আমাদের দেশীয় খাদ্যে কি পরিমাণে কোন্ পদার্থ মিলিত আছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। তাহার একটী তালিকা ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৪, তারিখের হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

আহার্য্যদ্রব্য	কোন্ পদার্থ শতকরা কি পরিমাণে মিলিত আছে।			
	মাংস-উৎপাদক	উত্তাপ-উৎপাদক	ধাতবদ্রব্য	বসা ও জলীয় দ্রব্য
চাউল	৭	৭৮	১	১৪
সাগুদানা, আরারুট, পানিফল ...	৪	৮২	১	১৩
আলু	২	২৩	১	৭৪
চিনি	...	১০০	...	...
ঘি	...	১০০	...	...
গম	১৩	৭২	২	১৩
জনার	৯	৭৫	২	১৪
জওয়ারি	৯	৭৪	১	১৬
বজরা	১০	৭৩	২	১৫
কাঙ্নি	১২	৭০	১	১৭
যই	১১	৬৯	৩	১৭
যব	১১	৭৫	২	১৫
মাছ	১৪	৭	১	৭৪
মাংস	২২	১৪	১	৬৩
ছোলার দাল ...	১৯	৬২	৩	১৬
অরহরের দাল ...	২০	৬১	৩	১৬
মটরের দাল ...	২৫	৫৮	২	১৫
মসুরের দাল ...	২৪	৫৯	২	১৫
খেঁসারির দাল ...	২৮	৫৬	৩	১৩
বরবটীর দাল ...	২৪	৫৯	৩	১৪
মুগের দাল ...	২৪	৬০	৩	১৩
মাসকলাইয়ের দাল	২২	৬২	৩	১৩
কড়াইশুঁটি ...	৭	৩৬	২	৫৫
দুধ	৫	৮	১	৮৬

অতি সাবধানতার সহিত আহার গ্রহণ করা আবশ্যক। আহারের সহিত যে সকল পদার্থ শরীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা যদি শরীরের উপযোগী না হয় তবে পীড়া ও মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে। আবার, যথোচিতরূপে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন জন্য যে পরিমাণে যে পদার্থের প্রয়োজন তাহার ন্যূনাধিক্যেও স্বাস্থ্যনাশ হইয়া থাকে। এজন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর সামগ্রী ভোজন করা আবশ্যক। দূষিত, গলিত বা দুর্গন্ধ যুক্ত সামগ্রী কদাচ গ্রহণ করা উচিত নয়।

যে দ্রব্য অল্প পরিমাণে ভোজন করিলে উপকার ও বলাধান হয়, তাহাই আবার অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। সুতরাং আহার্য্য সামগ্রী সাবধানতার সহিত পরিমিতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। অতি ভোজন অত্যন্ত অনিষ্ট-কর। অতি ভোজন জন্য কেবল যে পীড়া উপস্থিত হয় এমন নহে—নিরন্তর অতি ভোজনে মনের দুর্ব্ব-লতা উপস্থিত হয়।

যে দ্রব্য এক ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর ও উপকারী তাহা অন্যের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে। পরি-পাক সম্বন্ধে উদরের এক প্রকার অভ্যাস ও রুচি আছে; এজন্য সম্পূর্ণ নূতন প্রকার আহার্য্য কখন

কখন অসুখকর হয় ও তাহা পরিপাকে বিলম্ব হয়। এই কারণেই কোন কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে নিতান্ত অতৃপ্তিকর হয়। যে ব্যক্তি যে সকল সামগ্রী সহজে পরিপাক করিতে পারেন, এবং রুচির সহিত ভোজন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই গ্রহণ করা বিধেয়।

আমরা বাজারে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকি, কখন কখন তাহার সহিত দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে; তাহা ভক্ষণে কখন কখন আমাদিগকে রোগ যাতনা ভোগ করিতে হয়। এজন্য বাজারের দ্রব্য যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

আমাদের আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে এরূপ অনেক দ্রব্য আছে যে, তাহা সময় ও অবস্থামত গ্রহণ করিলে আমরা অনেক সময়ে পীড়ার আক্রমণ রোধ বা রোগযাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। কোন কোন দ্রব্যে উদরের ক্রিয়া ভাল হয়—কোন দ্রব্যে মস্তিষ্কের বলাধান হয়—কোন দ্রব্যে রক্ত পরিষ্কার হয়—কোন দ্রব্যে বা পেশীর সবলতা হয়; ইত্যাদি। আমরা একটু মনোযোগী হইলেই আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ অবগত হইতে পারি।

ক্ষুধা উদরের প্রার্থনাস্বরূপ। সুস্থ শরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই বুঝা গেল যে শরীরে আহার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে। যখন ক্ষুধা নাই তখন আহারের প্রয়োজন নাই। ক্ষুধার সময় কিছু আহার না করা যেমন অনিষ্টকর, অক্ষুধায় ভোজন তদনুরূপ। এক সময়ে প্রভূত আহার গ্রহণ না করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প আহার গ্রহণে অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা।

আহার সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে নিতান্তই অব্যবস্থা দেখা যায়। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে, যাঁহারা প্রাতে ৮টা বা ৯টার সময় অতি দ্রুতবেগে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন এবং সমস্তদিন গুরুতর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে, নির্জ্জীবভাবে গৃহে প্রত্যাগত হন। এই সময়ের মধ্যে একবার কিছু আহার গ্রহণ করিলে এরূপ দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা থাকে না। অনেকের পক্ষে আহার যেন একটা বিষম উৎপাত,—কোনরূপে শীঘ্র সমাধান হইলেই মঙ্গল! এরূপ ব্যক্তি যে অচিরাৎ স্বাস্থ্যহীন হইবেন তাহার বিচিত্র কি? বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এ বিষয়ে অত্যন্ত অমনোযোগী দেখা যায় এবং এই জন্য অপরিণত বয়সে

ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অনেকে ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করেন।

তাড়াতাড়ি আহার করা অতি নিষিদ্ধ। আহার্য্য সামগ্রী উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করা উচিত; তাহাতে পরিপাকের বিশেষ সহায়তা হয়। যে সকল কঠিন দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইয়া উদরস্থ হয়, তাহাকে দ্রবীভূত করিতে উদরের ক্রিয়া অধিকতর শ্রমজনক হয়, এবং সর্ব্বদা এইরূপ হইলে উদরের দুর্ব্বলতা ও জীর্ণশক্তি হ্রাস হয়। আবার, দ্রুতভোজনে প্রচুর পরিমাণে লালারস আহারের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না; এজন্য পরিপাক ক্রিয়া বিলম্বে সম্পন্ন হয়। চর্ব্বণ ক্রিয়ার জন্য দন্ত অতি মূল্যবান যন্ত্র। দন্তকে যত্নে রক্ষা করা আবশ্যক। দন্ত রক্ষার প্রধান উপায় তাহাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা।

আমাদের দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পরিশ্রম দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। পূর্ব্বকালে যেরূপ আহার গ্রহণে জীবনধারণ সম্ভবপর ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পানীয়।—স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য বিশুদ্ধ জল পান

করা আবশ্যক। দূষিত জলপানে আমরা অচিরাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকি। জলের সহিত নানাবিধ অপকারী পদার্থ মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দূষিত করে। সেই সকল পদার্থ জলের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রক্ত দূষিত হয়। পানীয় জল সম্বন্ধে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অত্যন্ত অব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক স্থানে কেবল পানীয় জলের দোষে সহস্র সহস্র লোক রোগ যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পুষ্করিণী বা বিলের জল পান করা হয়। বহুকাল যাবৎ তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় না। তলস্থ ভূমি কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া তাহাতে বিষবৎ গ্যাস উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশের আর একটী কদর্য্য মহান্ অনিষ্টকারী নিয়ম এই যে, যে পুষ্করিণীতে স্নান ও শৌচ কর্ম্মাদি সম্পন্ন করা হয়, সেই পুষ্করিণীর জল পান করা হইয়া থাকে। ইহা যে কতদূর ঘৃণিত ও দূষিত নিয়ম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যে পুষ্করিণীর জল পান করা হয়, কোন মতেই সেই পুষ্করিণীতে অবগাহনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেওয়া উচিত নয়। একটী পুষ্করিণীর জল অল্পদিনে দূষিত হয় না বটে, কিন্তু

অবিরত অবগাহন ও শৌচ কর্ম্মাদি দ্বারা তাহা যে ক্রমে দূষিত ও পরিশেষে বিষবৎ হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে পুষ্করিণীর জল পান করা হয়, তাহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করা উচিত নয়। গাছের পাতা জলে পতিত হইয়া তাহাকে দূষিত করে। যেখানে পুষ্করিণীর জল দূষিত ও নদীর জল দুষ্প্রাপ্য, সেখানে কূপ-জল পান করা উচিত। যেখানে বিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য সেখানে সিদ্ধ জল ছাকিয়া শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। কয়লা ও বালুকা দ্বারা জল পরিষ্কার করিয়া লইলে তাহার অপকারিতা অনেক পরিমাণে দূর হয়।

বায়ু।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নাসিকা-পথে যে বায়ু শ্বাসযন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। সেই বায়ু যদি কোন প্রকারে দূষিত হয়, তবে আমরা অচিরাৎ পীড়াগ্রস্ত হই। যাহাতে আমরা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারি, সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করা আবশ্যক।

স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকারী পদার্থসংযোগে বায়ু দূষিত হয়। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ গলিত হইয়া বিষময় বাষ্প উৎপাদন করে। পুরাতন, দূষিত জলপূর্ণ গর্ত্ত, পুষ্করিণী, বিল, খাল ইত্যাদি

স্থান হইতে দূষিত বাষ্প উদ্গত হয়। প্রশ্বাসের সহিত আমরা দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করি, এজন্য বহুজনাকীর্ণ স্থানের বায়ু অচিরাৎ দূষিত হয়। সাধারণতঃ, যে বায়ু দুর্গন্ধময় বা অসুখকর তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকারী, যাহা সুগন্ধযুক্ত বা সুখকর তাহা উপকারী। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার দয়া-ব্যঞ্জক একটী চমৎকার নিয়ম। এরূপ না হইলে বায়ুর উপকারিতা বা অপকারিতা সর্ব্বদা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা কঠিন হইত।

গৃহ নির্ম্মাণকালে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাহিরের বায়ু যাহাতে বিনা অবরোধে গৃহের অভ্যন্তরে গমনাগমন করিতে পারে, তাহার উপযোগী দ্বার ও গবাক্ষ স্থাপিত করা উচিত। গৃহের অতি নিকটে জঙ্গল বা বৃক্ষের অস্তিত্ব প্রার্থনীয় নহে। তদ্দ্বারা বায়ুর গতি রোধ হয়; আবার, রজনীতে বৃক্ষ-সহবাস অতীব অনিষ্টকারী।

বাসস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, নতুবা গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। গৃহের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অবস্থা অনুযায়ী, কিয়দ্দূর পরিস্কৃত ও শূন্য রাখা বিধেয়। যেমন পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, সেইরূপ

সাধ্যানুসারে, বাসস্থান সুশোভিত করা উচিত। চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা করিতে পারেন। গৃহের অনতিদূরে সুগন্ধ কুসুম তরুলতার শোভা কি মনোরম! ইহা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্যক উপযোগী। কুসুম-গন্ধ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার সাধন করে।

গৃহের পয়ঃপ্রণালী অতি যত্নের সহিত পরিষ্কৃত রাখা উচিত। তাহা এরূপভাবে গঠন করা আবশ্যক যে জল পড়িবামাত্র বহিয়া যায়। পল্লীগ্রামের অনেক বাটীতেই কাঁচা নর্দ্দামা;—তাহাও সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা হয় না। ভালরূপে নিঃসরিত হইতে না পাইয়া, নর্দ্দামা-প্রবাহিত জল তাহার তলস্থ ভূমিতে শোষিত হয়; সুতরাং নর্দ্দামা সর্ব্বদা কর্দ্দমাক্ত ও দুর্গন্ধময় থাকে। পাকা নর্দ্দামাও ক্রমে ময়লাপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু দূষিত করে। নিয়মিতরূপে নর্দ্দামা পরিষ্কারের প্রথা প্রায় কোথাও দেখা যায় না। অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ উৎপাদিত না হইলে গৃহবাসীর দৃষ্টি সে দিকে পতিত হয় না। কিন্তু দূষিত পয়ঃপ্রণালীতে নানা রোগ বিচরণ করে। বঙ্গে প্রবাদ আছে যে, ময়লা অপরিষ্কৃত স্থান পিশাচগণের নিবাসভূমি। ইহা সত্য না হউক, কিন্তু পিশাচরূপী নানাবিধ উৎকট রোগ যে পূতি-

গন্ধপূর্ণ অপরিস্কৃত স্থানে সর্ব্বদা বিচরণ করে. তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

স্নান ও গাত্রমার্জ্জন।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্নান ও গাত্রমার্জ্জন অতি প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহের অভ্যন্তরে ক্রমাগত একপ্রকার দাহকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। দেহের অভ্যন্তরস্থ, অনাবশ্যক, দূষিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সকল ক্রমাগত দেহের নানা পথ দিয়া বহির্গত হইতেছে। যে চর্ম্মদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত, তাহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্রে পরিপূর্ণ। আমরা সেই সকল ছিদ্রকে লোমকূপ বলিয়া থাকি। ইহাও দেহের একটী পথস্বরূপ। লোমকূপ-পথে দেহস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত, দূষিত পদার্থ সকল ক্লেদ ও অদৃশ্য বাষ্পরূপে ক্রমাগত নির্গত হইতেছে। সুতরাং লোমকূপ সকল সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখা উচিত, নতুবা উল্লিখিত ক্লেদ ও বাষ্প বহির্গত হইতে না পাইয়া রক্ত দূষিত হয় ও পীড়া উৎপাদন করে। কারণ, যখন চর্ম্মের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত না হয়, তখন লোমকূপ-পথে যে পরিমাণে দূষিত পদার্থ বহির্গত হইতে পারিত তাহা নির্গত করিবার জন্য মূত্রযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া প্রবলতর হইয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ ঐ যন্ত্রদ্বয় পীড়িত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, লোমকূপ-পথে যে পরি-

মাণে দূষিত পদার্থ নির্গত হইতে পারিত, সে পরিমাণে মূত্রযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র দ্বারা অপসারিত হইতে না পারিয়া, কিয়দংশ রক্তের সহিত মিলিত থাকে, এজন্য নানা পীড়া উপস্থিত হয়।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে জল ব্যতীত জীবন ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু জলের যে মহোপকারী শক্তি আছে, তাহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি না। দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে —কোন স্থানে আঘাত লাগিলে—মাথা ধরিলে— অনেক সময়ে কেবল জল প্রয়োগে তাহা নিবারিত হয়। কখন কখন এরূপ জ্বর উপস্থিত হয় যে স্নান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে তাহা নিবারিত হয় না। হাইড্রোপেথিক চিকিৎসকদিগের মতে কেবল জল দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। ইহা সত্য হউক বা না হউক, অবস্থা বিশেষে বিবেচনা পূর্ব্বক জল প্রয়োগ করিতে পারিলে যে কোন কোন পীড়া উপশম হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে, স্নান যে শারীরিক ক্রিয়ার পক্ষে আবশ্যক তাহা তুমি অনুভব করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। তদ্দারা কোন্ কোন্ শারীরিক প্রয়োজন সাধিত হয়, একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ।

প্রথমতঃ, জলের স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ স্নান দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলের বলাধান হয় এবং শরীর সবল হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্নান দ্বারা উল্লিখিত শারীরিক বাষ্প উদ্গমন ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। তৃতীয়তঃ, দেহস্থ ক্লেদাদি ধৌত হইয়া লোমকূপ সকল পরিষ্কৃত হয় এবং তদ্দ্বারা ক্লেদ ও বাষ্প উদ্গমনের সহায়তা হয়। চতুর্থতঃ, জল সংস্পর্শে কৈশিকা নাড়ীগণ কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ রক্ত ভিতরের দিকে চালিত হয়, গাত্রমার্জ্জন ও স্নানান্তে শুষ্ক বসনে দেহ ঘর্ষণ দ্বারা পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ হয়। এতদ্দ্বারা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা হয় এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রের অল্প বা অধিক পরিমাণে উপকার সাধিত হয়।

সুস্থ সবলকায় ব্যক্তিগণের পক্ষে শীতল জলে এবং দুর্ব্বল ও পীড়িতের পক্ষে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান বিধেয়। কিন্তু কোন্ প্রকার স্নান কাহার পক্ষে উপযোগী তাহা পরীক্ষা দ্বারা সহজে স্থির করা যাইতে পারে। যে সকল দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তি উষ্ণজলে স্নান সহ্য করিতেও অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে, উষ্ণজলে পরিষ্কার বস্ত্র সিক্ত ও নিষ্পীড়িত করিয়া তদ্দ্বারা দেহ মার্জ্জন করা বিধেয় এবং তৎপরে শুষ্ক বসন দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করা বিশেষ উপকারী। বেগবতী নদীজলে অবগাহন সুখকর ও উপকারী।

দূষিত জলে কদাচ স্নান করা উচিত নহে। যেখানে নদী নাই এবং পুষ্করিণী বা বিলের জল দূষিত; সেখানে পরিষ্কার কূপজলে অনায়াসে স্নান করা যাইতে পারে। যেখানে বিশুদ্ধ জল দুষ্প্রাপ্য সেখানে জল সিদ্ধ ও শীতল করিয়া স্নান করা উচিত।

হিন্দু জাতির মধ্যে স্নান চিরপ্রসিদ্ধ ও আদরণীয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম—সন্ধ্যা আহ্নিক—সকলই স্নানান্তে ব্যবস্থা। ইহা অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। স্নানান্তে যেমন শরীর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়, কিয়ৎ পরিমাণে মনও সেই রূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম কর্ম্মের সেই উৎকৃষ্ট সময়। নিয়মিত স্নান সুনীতি সঞ্চারের সহকারী।

পরিচ্ছন্নতা।—যেমন গৃহ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পরিষ্কার রাখিবে—যেমন দেহ পরিষ্কৃত রাখিবে—সেইরূপ পরিধেয় বসনাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে যত্ন করিবে। শয্যা, বসন প্রভৃতি অপরিষ্কৃত থাকিলে যে শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। পরিচ্ছন্নতার সহিত সুনীতির অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অপরিচ্ছন্নতার সহিত সুনীতি দীর্ঘকাল বাস করিতে পারে না। পূজনীয় হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন—এই জন্যই তাঁহারা পরিচ্ছন্নতার বিশেষ পক্ষপাতী।

পরিশ্রম।—মানবমন, মানবদেহ এবং দৈহিক ক্রিয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, পরিশ্রম সম্যক্‌রূপে তাহারই উপযোগী। বিনা পরিশ্রমে জীবন ধারণ অসম্ভব। সুতরাং ইচ্ছা কর বা না কর, পরিশ্রম অপরিহার্য্য।

জীবিকা অর্জ্জন পরিশ্রম সাপেক্ষ। পরিশ্রমের সহিত শরীরাভ্যন্তরস্থ নানাবিধ প্রক্রিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। পরিশ্রম দ্বারা পরিপাক, রক্তসঞ্চালন, রক্ত-পরিষ্কার ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়ার সহায়তা হয়। পরিশ্রম অভাবে শরীর স্ফূর্ত্তিবিহীন, বলহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে ও ক্রমে অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়াম।—যদি জীবিকা অর্জ্জন ও সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহে যথোচিতরূপে শারীরিক পরিশ্রম না হয়, তবে নিয়মিতরূপে শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক। ব্যায়াম নানা উপায়ে হইতে পারে,—যাঁহার যে প্রকারে সুবিধা হয়, তিনি সেই রূপে করিতে পারেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ডন, মুগুর ও কুস্তি অতি প্রিয় ব্যায়াম। বঙ্গদেশেও কোন কোন

ব্যক্তি ঐরূপ ব্যায়াম করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ব্যায়াম সকলের পক্ষে উপযোগী, তৃপ্তিকর বা সম্ভবপর না হইতে পারে। অশ্বারোহণেও উত্তম পরিশ্রম হইতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সুলভ বা উপযোগী নহে।

বঙ্গদেশে সন্তরণ অতি সুলভ ব্যায়াম; নদী, বিল, পুষ্করিণী চতুর্দ্দিকে। যাঁহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ভ্রমণের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা রাখিতে পারেন। প্রতিদিন স্বহস্তে দাঁড় বাহিয়া কিছুদূর গমন করিলে পরিশ্রমের সহিত আনন্দ লাভ হইতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই এরূপ সুখকর ব্যায়ামের উপায় সত্ত্বেও অতি অল্প ব্যক্তিকেই ইহাতে অনুরক্ত দেখা যায়।

যদি তোমার গৃহের নিকটে উদ্যান বা পতিত ভূমি থাকে, তবে তুমি সেখানে অবকাশকালে, স্বচ্ছন্দে ভূমি খনন, বৃক্ষ রোপণ, বৃক্ষ কর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্যে পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পার। তুমি হয়ত বলিবে:—"এরূপ পরিশ্রম কি ভদ্রলোকের উপযোগী? আমি কি নীচ লোক যে স্বহস্তে ভূমি খনন, বৃক্ষচ্ছেদন করিব।" গভীর পরিতাপের বিষয় যে জাতীয় মনে এই অনিষ্টকারী সংস্কার বদ্ধমূল

হইয়াছে! যিনি যে পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রমে অসমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক!! এই সংস্কারের বিষময় ফল আমরা সমাজের চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। শ্রমকাতরতাবশতঃ কেবল যে স্বাস্থ্য নাশ হয় এমন নহে,—ক্রমে দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়, অপদার্থ মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং সমাজের বলক্ষয় হয়। যে জাতির মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা প্রবল হয়, সে জাতি কখন উন্নত সামাজিক জীবন লাভ করিতে পারে না। ভদ্রলোকদিগের শ্রমকাতরতার আর এক মহান্ অপকারিতা এই যে, সেই অসদ্দৃষ্টান্তে শ্রমজীবিদিগের চরিত্র ক্ষীণবল হয়—ভদ্রলোকদিগের অনুকরণে তাহারাও শ্রমকাতর হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশে দিন দিন তাহাই হইতেছে। বিনা পরিশ্রমে সুখলাভ হয় ইহাই সকলের কামনা। ইউরোপের সংস্কার অন্যপ্রকার। পরিশ্রমকে ইউরোপীয়গণ সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের প্রসূতিস্বরূপ মনে করেন। পরিশ্রমই ইউরোপের বর্ত্তমান সৌভাগ্যের একটী প্রবল কারণ। ইংলণ্ডের উজ্জ্বলমণি সুবিখ্যাত গ্লাডষ্টোন সাহেব "লিবারেল" নামক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি দুইবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যজগতেও তাঁহার নাম

বিশেষরূপে সমাদৃত। সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, তিনি, অবকাশ পাইবা মাত্র, আপনার হাউয়ার্ডিন পার্কে, স্বহস্তে বৃক্ষ ছেদন করেন, তাহা চিরিয়া তক্তা বাহির করেন, সেই তক্তা দ্বারা স্বহস্তে ফুলের গামলা ইত্যাদি গঠন করিয়া থাকেন। প্রাচীন বয়সেও তিনি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছেন এবং তাঁহার মনোবল ক্ষীণ হয় নাই।

ভ্রমণ অতি তৃপ্তিপ্রদ ব্যায়াম। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন এক বা দুই ঘণ্টা ভ্রমণ করিতে পারেন। ভ্রমণের একগুণ এই যে, যদি উৎকৃষ্ট শোভাময় স্থানে ভ্রমণ করিতে পার, তবে তদ্দ্বারা শারীরিক পরিশ্রমের সহিত মানসিক সজীবতা উপস্থিত হয়। বাহিরের স্বাভাবিক শোভা ও পরিষ্কৃত বায়ু যেন বলকারী ঔষধির ন্যায় মন ও শরীরের উপর কার্য্য করে। আর এক গুণ এই যে, প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ ব্যায়াম করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে পল্লিগ্রামে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর, অনেক সময় দুঃসাধ্য ও অনিষ্টকর। কিন্তু ব্যায়াম যদি তোমার দৈনিক নিয়ম হয়, তবে প্রাঙ্গণে, দালানে, ছাদের উপর একঘণ্টা নিয়মিতরূপে বেড়াইলে বাহিরে দুই মাইল ভ্রমণের কার্য্য হইবে। যদি একটু বেশী শ্রম করা প্রয়োজন

হয়, তবে দ্রুতপদে ভ্রমণ করা আবশ্যক। দৌড়িলে অল্পক্ষণেই যথেষ্ট শ্রম হইতে পারে, কিন্তু পীড়িত বা দুর্ব্বল লোকের পক্ষে ইহা বিধেয় নহে।

মৃগয়া দ্বারা উত্তম ব্যায়াম হইতে পারে, এবং বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ইহার যথেষ্ট চর্চ্চা হইতে পারে। প্রাচীনকালে ইহা আদরণীয় ছিল। ইউরোপীয় জাতিগণ এখনও মৃগয়াপ্রিয়। কিন্তু এবিষয়ে এদেশীয় অতি অল্প লোককেই আস্থাবান দেখা যায়।

ব্যায়াম উদ্দেশে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শ্রমোৎপাদক কতকগুলি গৃহকার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। গৃহে বসিয়াও বিশেষ বিশেষ প্রকারে হস্তপদাদি চালনা দ্বারা ব্যায়াম করা যাইতে পারে। এইরূপে ব্যায়াম করিবার নিয়ম ব্যায়াম বিষয়ক পুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

ব্যায়াম উদ্দেশে ক্রীড়া।—অনেক প্রকার ক্রীড়া দ্বারা উত্তম ব্যায়াম হইতে পারে। নৃত্যও এক প্রকার আনন্দজনক ব্যায়ামবিশেষ, কারণ তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পরিশ্রম হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশজাত শ্রমোৎপাদক সমস্ত ক্রীড়াই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে 'হাডু গুডু,' 'গেঁদ', 'গুলি ডাণ্ডা', 'ঝাল ঝাঁপ্পা', ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমজনক ক্রীড়া বঙ্গে আদরণীয়

ছিল। এতদ্ব্যতীত অম্বুবাচী, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্বাহে বঙ্গের নানা স্থানে নৃত্য, কুস্তী ও নানাবিধ শ্রমোৎপাদক ক্রীড়ার চর্চ্চা হইত। সামাজিক পরিবর্ত্তনে রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রমে ঐ সকল স্বাস্থ্যকর প্রাচীন ক্রীড়া অদর্শন হইয়াছে। ক্রিকেট, লনটেনিস্, পোলো প্রভৃতি শ্রমোৎপাদক বিলাতী ক্রীড়া এখনও জাতীয় ক্রীড়া মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে ক্রসবার হরিজণ্টালবার, প্রভৃতি উপাদানে ছাত্রদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা মঙ্গলের বিষয়। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রমকাতরতা যেন আমাদের জাতীয় মর্জ্জাগত ব্যাধি স্বরূপ হইয়াছে। ছোট বড় সকলেই শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ। নতুবা, ক্রিকেট এতদিন এদেশীয় ক্রীড়া মধ্যে পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই। বঙ্গের পার্শিগণ এই ক্রীড়ায় ইউরোপীয়গণের সহিত প্রশংসনীয়রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইতেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এতৎসম্বন্ধে আমরা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে অবস্থিত ছিলাম, এখনও সেই খানেই দণ্ডায়মান আছি।

ব্যায়াম বিষয়ে বঙ্গবাসীর মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, নিতান্তই অনাস্থা ও অব্যবস্থা

দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকে অনবরত মানসিক শ্রমে জীর্ণ ও শীর্ণকায় হইতেছেন, এবং অকালে শরীর নাশ করিতেছেন। অজীর্ণ (Dyspepsia), দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, বহুমূত্র ইত্যাদি নানা রোগ অনুদিন শিক্ষিত সমাজের বলক্ষয় করিতেছে। তথাপি তাহার প্রতিকারের দিকে কাহার দৃষ্টি নাই,—তথাপি শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য। ইহা বলা বাহুল্য যে, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব উল্লিখিত অমঙ্গলের একটী প্রধান কারণ।

বিশ্রাম।—স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য যেমন শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেইরূপ বিশ্রামও নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় বিশ্বনিয়ন্তা বিরাম-দায়িনী নিদ্রার সৃষ্টি করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইচ্ছার অধীন করেন নাই। নিদ্রাই আমাদের প্রধান বিশ্রাম এবং তাহার প্রশস্তকাল রজনী। আলোক অপেক্ষা অন্ধকার নিদ্রার অধিকতর উপযোগী। অন্ততঃ আট ঘণ্টা কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করা আবশ্যক। শারীরিক অবস্থানুসারে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে, ইহা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অল্প সময়েও চলিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ নিদ্রার জন্য ৮ ঘণ্টা উপযুক্ত সময়। দিবা-নিদ্রা প্রার্থনীয়

নহে। গ্রীষ্মকালে যখন রজনী ক্ষুদ্রায়তন হয় এবং রাত্রে সুনিদ্রা হয় না, তখন দিবাভাগে অল্পকালের জন্য নিদ্রা বিধেয়। অনেকে পরিশ্রম উদ্দেশে নিদ্রার কাল খর্ব্ব করিয়া থাকেন। যাঁহারা মানসিক শ্রমে ব্যাপৃত, অধিক পরিমাণে তাঁহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অবৈধ। অনেকে শয়ন পরে নানাবিধ চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাও নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শয়ন-গৃহে প্রবেশ মাত্র সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, বিশেষতঃ দুশ্চিন্তা বা গুরুতর চিন্তা বর্জ্জন করিবে—নিশ্চিন্ত মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিবে। নিদ্রা ব্যতীত, গুরুতর পরিশ্রমের সময়, মধ্যে মধ্যে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা বিধেয়। গুরু আহারের অব্যবহিত পরেই শ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

অনেক সময়ে যথোচিত বিশ্রাম অভাবে শরীর দুর্ব্বল ও পীড়িত এবং শ্রমশক্তি হ্রাস হয়। উপযুক্ত বিশ্রামের পর যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করা যায় এবং অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য সম্পাদন করা যায়, ক্রমাগত বিরামশূন্য পরিশ্রমে কখনই তাহা হইতে পারে না। উত্তম-রূপে, ফলোপধায়ীরূপে কার্য্য করিবার উপায় উপ-

যুক্ত বিশ্রাম। অতএব পরিশ্রমের পর শরীরকে যথোচিতরূপে বিশ্রাম দিবে—কখনও অবহেলা করিবে না।

দৈহিক শক্তি।—দয়াময় পরমেশ্বর মানব-দেহে যে সকল মহীয়সী শক্তি নিহিত করিয়াছেন, কোন মতেই সেই সকল শক্তির অপচয় বা অপ-ব্যবহার করা উচিত নয়—তাহাদিগকে অতি যত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আশুতৃপ্তিকর কার্য্যানুরোধে, স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, সেই সকল শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার করা হয়। তদ্দ্বারা পরিণামে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা যাতনা উপস্থিত হয়, জীবন শূন্য-ময় ও উপভোগ-বিহীন হইয়া পড়ে। একটু মনো-যোগের সহিত সমাজের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শক্তি যে উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই শক্তি সেই উদ্দেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করিবে। ইহাতেই তোমার মঙ্গল—ইহাতেই সুখ। এতদ্দ্বারা তুমি কর্ত্তব্যপালন করিতে সমর্থ হইবে। স্বাভাবিক নিয়ম ও ঈশ্বরের আজ্ঞা একই কথা। তাহা ভঙ্গ করিলে কখনই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

শারীরিক অপচয়—পরিশ্রম।

সংসারের সমস্ত কার্য্যই পরিশ্রমমূলক। জীবনরক্ষা, জ্ঞানলাভ, অর্থোপার্জ্জন, সমাজপত্তন, সমাজ পরিচালন, সমাজরক্ষা;—সকলই পরিশ্রমমূলক। মানসিক অপচয় বিষয়ক প্রস্তাবে মানসিক পরিশ্রমের বিষয় বলা হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতার বিষয় বলা হইয়াছে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য যে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, কিরূপে সেই শ্রমের অপচয় নিবারিত হইতে পারে—কিরূপে তাহা ফলোপধায়ী হইতে পারে—আমরা এই প্রস্তাবে কিয়ৎপরিমাণে তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

অর্থ।—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থনীতি শাস্ত্রানুসারে অর্থ তাহাকে বলে, যাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করা যায়। মুদ্রা অর্থ নহে। তাহা মূল্যনিরূপণ ও বিনিময়ের সুবিধার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে—সুতরাং তাহা অর্থের প্রতিনিধি স্বরূপ। সাধারণ সম্মতিক্রমে

লৌহমুদ্রা দ্বারাও স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। করেন্সি নোট দ্বারাও মুদ্রার কার্য্য হইয়া থাকে। কড়ি দ্বারাও ভারতবর্ষের নানা স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে মুদ্রার কার্য্য সাধিত হয়। ভূমি, গৃহ, চাউল, ধান্য, ছুতার নির্ম্মিত সামগ্রী, কামার নির্ম্মিত সামগ্রী, ইত্যাদি অর্থমধ্যে পরিগণিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, পিত্তল ইত্যাদি যদি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত না হয়, ও যদি তাহাদের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে তাহাও অর্থমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যদি এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহাদের বিনিময়ে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তবে সে অবস্থায় তাহা অর্থ নহে। জল, বায়ু জীবন ধারণ জন্য অপরিহার্য্য-রূপে প্রয়োজন। কিন্তু তাহা স্বভাবজাত ও অনায়াসলব্ধ; এজন্য তাহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। এজন্য তাহা অর্থ নহে। কিন্তু অভাব বশতঃ যদি জল ক্রয় করিতে হয়, তবে তাহাও অর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, কেবল মাত্র প্রয়োজনীয়তা বশতঃ কোন দ্রব্যের বিনিময়কারিতা নিরূপিত হইতে পারে না। জল, বায়ু, আলোকের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ আর কি আছে? কিন্তু

তাহার বিনিময়কারিতা নাই, কারণ তাহা অনায়াসলব্ধ। সুতরাং প্রয়োজনীয় এবং আয়াসলব্ধ না হইলে, কোন দ্রব্যই বিনিময় কার্য্যের উপযোগী এবং অর্থমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

অর্থ উৎপাদনের উপাদান।—অর্থনীতি শাস্ত্রে 'অর্থ' উৎপাদন জন্য ত্রিবিধ বস্তুর প্রয়োজন নিরূপিত হইয়াছে, যথা;—ভূমি, পরিশ্রম, মূলধন। সুতরাং পরিশ্রমের অপচয়, ফলোপধায়িতা ইত্যাদি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভ জন্য ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আমরা এ প্রস্তাবে দুই চারিটী মুখ্য বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

শারীরিক শক্তি ও বাহ্যিক পদার্থ।—শারীরিক শক্তি ও বাহ্যিক পদার্থ ব্যতীত পরিশ্রম অসম্ভব। শক্তি কাহাকে বলে তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। সম্মুখে এক ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছে, এক জন বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, অন্য এক জন কূপ হইতে জল তুলিতেছে;—এক জন ছুতার বাক্স গড়িতেছে, একজন কামার দা গড়িতেছে, একটী স্ত্রীলোক রন্ধন করিতেছে। তুমি বলিবে এ সমস্ত কার্য্যই শারীরিক শক্তির ক্রিয়া। ঝটিকায় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে—অগ্নি সংযোগে

গৃহ দগ্ধ হইয়াছে—বন্যাজলে গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে —বজ্রপাতে গৃহ চূর্ণ হইয়াছে—ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—বৃক্ষ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। তুমি বলিবে, এ সমস্তই বাহ্যিক পদার্থের শক্তির ক্রিয়া। উত্তম কথা। যেমন তোমার দেহের অভ্যন্তরে শক্তি, সেইরূপ বাহ্যিক পদার্থে শক্তি; এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার অভ্যন্তরে শক্তি নাই। জলে শক্তি—ভূমিতে শক্তি—বায়ুতে শক্তি—প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে শক্তি,—চারিদিক শক্তিময়—আমরা অসীম শক্তিসাগরে ভাসিতেছি।

তুমি কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পার না—কোন নূতন শক্তি সৃষ্টি করিতে পার না। তুমি যে কোন কার্য্য কর—যে সামগ্রী নির্ম্মাণ কর—যে দ্রব্য গঠন কর—সে সমস্তই তোমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং বাহ্যিক পদার্থ ও তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি সংযোগে হইতেছে। সত্য বটে মানুষে রেল গাড়ি চালাইতেছে, তাহার বুদ্ধি ও শ্রমবলে বাষ্পীয় কল নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু লৌহ মানবের হস্তজাত পদার্থ নহে। লৌহ বিনা এঞ্জিন নির্ম্মিত হইতে পারিত না। এঞ্জিন গঠনে জল, অগ্নি ইত্যাদির প্রয়োজন; তাহাও মানব-হস্তজাত নহে। আবার, এঞ্জিন চালিত করিবার জন্য বাষ্পের প্রয়ো-

জন। বাষ্প জন্য জল ও অগ্নির প্রয়োজন, অগ্নি জন্য কাষ্ঠের প্রয়োজন। সুতরাং যে শক্তিবলে এঞ্জিন চালিত হইতেছে, তাহা জল ও কাষ্ঠে নিহিত রহিয়াছে। ইহার অভাবে কেহই রেল গাড়ি চালাইতে পারিত না।

কৃষক বিপুল শ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু বীজ ব্যতীত শস্য হয় না,—বীজ-উৎপাদন মনুষ্যের সাধ্যাতীত। ভূমি, রৌদ্র, জল, বায়ু ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত, বৃক্ষে পরিণত ও ফলপ্রসু হইতে পারে না,—ইহার কিছুই মানবহস্তজাত নহে। আবার দেখ, যদি বীজের ও ভূমির অভ্যন্তরে শক্তি না থাকিত—বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যদি ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি স্বাভাবিক পদার্থ হইতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবার উপযোগী সামগ্রী সকল আহরণ করিতে না পারিত—তবে কৃষক আজীবন পরিশ্রমেও এক দিনের আহারোপযুক্ত শস্য উৎপাদন করিতে পারিত না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, বিশ্বনিয়ন্তা যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই সকল পদার্থে ও মানবদেহে যে সকল শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তুমি যাহা কিছু কর, সকলই সেই উপাদানে ও সেই শক্তিবলে,—তাহা ব্যতীত তুমি কিছুই করিতে পার না।

পরিশ্রম কি ?—এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যাহাকে অর্থ উৎপাদনকারী পরিশ্রম বলিয়া থাক, তাহা কি ? সে পরিশ্রম আর কিছুই নহে, কেবল বাহ্যিক পদার্থের উপর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাহায্যে, মানবের আভ্যন্তরিক শক্তির ক্রিয়া মাত্র। সেই শক্তি বাহ্যিক পদার্থের শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া সংসারের সমস্ত প্রয়োজন সাধন করে। এক ব্যক্তি উদ্যানে জল সেচন করিতেছে। তাহার দৈহিক শক্তি জলের উপর ক্রিয়াবান হইতেছে মাত্র,—সে কেবল দৈহিক বল প্রয়োগে জলকে স্থানান্তরিত করিতেছে। কৃষক শস্যোৎপাদন করিতেছে। প্রথমতঃ, সে ভূমি কর্ষণ করিল,—তাহার দৈহিক বল ভূমির উপর ক্রিয়াবান হইল মাত্র। সে বীজ আনিয়া বপন করিল,—তাহার দৈহিক শক্তি বীজের উপর ক্রিয়াবান হইল মাত্র। শস্য ফলিল, সে তাহা কাটিয়া মাড়িয়া গৃহে লইয়া গেল,—তাহার দৈহিক শক্তি শস্যের উপর ক্রিয়াবান হইল মাত্র। শস্যোৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়ায়, কৃষকের আভ্যন্তরিক শক্তি ভূমি, জল, বায়ু, বীজ, ইত্যাদি বাহ্যিক পদার্থের শক্তিকে [illegible] করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধন করিল।*

---

* মিল সাহেব তাঁহার Political Economy নামক পুস্তকে অর্থোৎ

সামাজিক কার্য্যপ্রণালী।—এক্ষণে তুমি একবার সমাজের গঠন ও কার্য্য পরিচালন প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমাজ-অভ্যন্তরে কত ব্যবস্থা—কত ব্যস্ততা—কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য সাধিত হইতেছে। চারিদিকেই পরিশ্রমের খেলা। কৃষক শস্য উৎপাদন করিতেছে—তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে—কর্ম্মকার কৃষকের কার্য্যোপযোগী এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী গঠন করিতেছে—সূত্রধার নানাবিধ কাষ্ঠের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে—বৈদ্য চিকিৎসা করিতেছে—রাজমিস্ত্রিগণ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। এইরূপে নানা ব্যবসায়ের লোক আপনাপন নিয়মিত কার্য্য পরিচালন করিতেছে—বণিকগণ নানা দেশ হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য এদেশে এবং এদেশ-জাত নানা দ্রব্য অন্যদেশে লইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমাজরক্ষা সাধিত হইতেছে। বিদেশীয় জাতির আক্রমণ নিবারণ—দেশীয় দস্যু তস্করের আক্রমণ ও অপহরণ নিবারণ—সাধারণের স্বত্ব ব্যবস্থাপন—স্বত্ব ও শান্তিরক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা গঠন—যথানিয়মে ব্যবস্থা প্রয়োগ জন্য বিচারালয় সংস্থাপন—

পাদক পরিশ্রম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহা কেবল পদার্থকে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করা—স্থানান্তরিত করা—চালিত করা মাত্র।

জাতীয় শিক্ষা বিধান—ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে।

কিন্তু উল্লিখিত কৃষক যদি কেবল মাত্র নিজ পরিবার পোষণের উপযুক্ত শস্যোৎপাদন করিত—তন্তুবায় কেবল মাত্র নিজ পরিবারের পরিধেয় বসন বয়ন করিত—কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি কেবল মাত্র নিজ নিজ গৃহের আবশ্যকীয় দ্রব্য গঠন করিত—চিকিৎসক কেবল নিজ পরিবারের চিকিৎসা করিত—বণিকগণ কেবল নিজ নিজ গৃহের প্রয়োজন জন্য অন্যদেশীয় দ্রব্য আনয়ন করিত—তাহা হইলে, বর্ত্তমান সামাজিক অস্তিত্ব অসম্ভব হইত; প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবন ধারণোপযুক্ত সমস্ত কার্য্য স্বয়ং করিতে হইত।

বিনিময়।—বিনিময়-ক্রিয়া দ্বারা সমাজের বর্ত্তমান অস্তিত্ব সম্ভব ও রক্ষিত হইতেছে। এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য লাভ করাকে বিনিময় বলে। কৃষক যদি কেবল মাত্র নিজ আহারের উপযুক্ত শস্য উৎপাদন করিত, তবে সে বস্ত্র কোথা পাইত?—কে তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিত?—কে তাহার চিকিৎসা করিত?—কে তাহার লাঙ্গল, গাড়ী ইত্যাদি গঠন করিত?—সে ভূকর্ষণ জন্য বলদ কোথা পাইত?—লবণ, তৈল ইত্যাদি নানা

সামগ্রী কোথা পাইত? এই সকল অভাব পূরণ জন্য কৃষককে, নিজ আহারের জন্য যে শস্য প্রয়োজন, তদপেক্ষা কিছু অধিক শস্য উৎপাদন করিতে হয়। অতিরিক্ত শস্য বিনিময় বা বিক্রয় করিয়া, তাহাকে জীবন ধারণোপযোগী অপরাপর সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিতে হয়। তন্ত্রবায়, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজন ব্যতীত, লাভ উদ্দেশে, অন্যের প্রয়োজন সাধনে অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয়। সেই অতিরিক্ত শ্রমে, বা সেই অতিরিক্ত শ্রম-জাত সামগ্রী বিক্রয়ে যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অপরাপর সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়।

অতি পুরাকালে—যখন মুদ্রার সৃষ্টি হয় নাই—এক দ্রব্য বিনিময়ে অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ শ্রম-জাত দ্রব্য লইয়া হাটে বা অন্য স্থানে যাইতে হইত, এবং তাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। ইহাতে অনেক পরিশ্রম ও অসুবিধা হইত। ক্রমে সভ্যতার অভ্যুদয়ে মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিনিময় কার্য্যের অসীম সুবিধা ও তদ্দ্বারা প্রভূত সামাজিক উন্নতি ও অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে আমরা

ব্যবসায় বাণিজ্যের যেরূপ প্রবলতা দেখিতেছি, মুদ্রা ব্যতীত তাহা অসম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রা অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপ। এক্ষণে আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে বা শ্রম-জাত দ্রব্যের বিনিময়ে মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মুদ্রা দ্বারাই আমাদের সমস্ত সাংসারিক প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। যখন যাহা প্রয়োজন, মুদ্রা বিনিময়ে অনায়াসে তাহা লাভ করা যায়। শ্রমজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা মুদ্রা রক্ষা করা ও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া সহজ কার্য্য। মুদ্রার এই গুণবশতঃ, তাহা অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপ বিনিময় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া, সমাজের কত উন্নতি, কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে।

সমাজের উৎপত্তি।—এখন যেমন দেখিতেছ, সমাজ কি এই ভাবেই চিরদিন আছে? উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিয়ম যেমন মানব দেহে দেখিতেছ, বহির্জ্জগতে দেখিতেছ, সমাজ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ক্রিয়াবান। মাতৃগর্ভস্থ ক্ষুদ্র রক্তপিণ্ড পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া, যেমন তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকাশমান হয় ও অবশেষে পূর্ণাবয়ব শিশুতে পরিণত হয়,—যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষুদ্র ও কোমল অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ সকল পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও সবল হয়, ও অবশেষে ক্ষুদ্র শিশু পূর্ণায়তন দৃঢ়কায় মনুষ্যে পরিণত হয়,—সমাজ গঠন সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে সেইরূপ।

এক্ষণে যেরূপ সমাজের আকার দেখিতেছ, পূরাকালে সেরূপ ছিল না। অতি প্রাচীনকালে মানবজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিত,—কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তাহারা মৃগয়া-লব্ধ মাংস ও অরণ্যের ফল মূল ভক্ষণে ক্ষুধা নিবারণ—নির্ঝর ও নদীজলে পিপাসা শান্তি—পশুচর্ম্মে দেহাবরণ এবং পর্ব্বত-গুহায় বা বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত। সেই অবস্থায় তাহারা বন্য পশুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এখনও পৃথিবীর নানা স্থানে সেইরূপ অরণ্যবাসী মানবদল দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যেমন প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে পরস্পর মিলিত হইবার শক্তি নিহিত আছে, সেইরূপ তাহাদের মনেও সামাজিক জীবনের বীজ নিহিত ছিল।

তুমি মনে করিতে পার,—এক্ষণে আমরা মানব মনের যে প্রতিভা ও অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি, সেই প্রাচীনকালে সে শক্তি কোথায় ছিল? সংসারের অপরাপর বিষয়ের ন্যায়

মানব মনের বিকাশও ক্রমে ক্রমে হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। সেইকাল মানবজাতির বাল্যাবস্থা। মানসিক শক্তি যেমন শিশুর মনে অস্ফুট থাকে, বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বিকাশিত হয়, মানবজাতির বাল্যাবস্থাতেও মানসিক শক্তি সেইরূপ অস্ফুট ছিল। সেই দূরবর্ত্তী কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ক্রমে তাহা বিকাশমান হইয়া আসিতেছে।

সেই অবস্থায়, দৈবদুর্যোগ, বন্য পশুর অভাব, ইত্যাদি কারণ বশতঃ তাহাদিগকে কখন কখন অনাহারেও থাকিতে হইত। ক্রমে, একটু একটু করিয়া যেমন মনের বিকাশ হইতে লাগিল—তাহাদের সংখ্যা ও বহুদর্শিতা বাড়িতে লাগিল,—তাহারা পশুপালন এবং পশুচর্ম্ম ও বৃক্ষশাখা দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ শিক্ষা করিল। বহুদর্শিতা ও বংশবৃদ্ধি সহকারে তাহারা, কিয়ৎপরিমাণে, শস্যোৎপাদন শিক্ষা করিল। এখন পর্য্যন্ত রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থাপিত বা সম্পত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উদ্রেক হয় নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই অবস্থায় সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন দলে পরস্পর যুদ্ধ হইত। কখন কখন পরাজিত দল জয়কারী দলে মিলিয়া যাইত।

এইরূপ মিলন ও স্বাভাবিক উৎপত্তি দ্বারা যেমন

এক একটী দল বিশেষরূপে পুষ্ট ও প্রবল হইতে লাগিল, সেইরূপ অধিক পরিমাণে আহার্য্যের প্রয়োজন হইতে আরম্ভ হইল, এবং দলের রক্ষা ও সুশৃঙ্খলে কার্য্য পরিচালন জন্য নেতার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কে নেতা হইবে? যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বাহুবলে, সাহসে শ্রেষ্ঠ, রণকুশল ও মৃগয়ানিপুণ, তাঁহাকেই অপরাপর সকলেই নেতৃরূপে বরণ করিল। কিন্তু দলস্থ অন্যান্য লোকের সহিত তাঁহার অন্য কোন প্রভেদ ছিল না; তাহারাও যে কার্য্য করিত, তিনিও তাহাই করিতেন; কেবল যুদ্ধ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যের সময় অপরাপর সকলে তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী হইত।

এ পর্য্যন্ত দলস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই জীবন ধারণোপযোগী সমস্ত কার্য্যই করিতে হইত—শ্রম-বিভাজন এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ক্রমে এক একটী দলে সহস্র সহস্র লোক হইয়া উঠিল—সমাজের পত্তন আরম্ভ হইল,—কেবল মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ অসম্ভব হইল। আহারের অভাব তাহাদের কৃষিকার্য্যনিপুণতার প্রসূতি হইল। কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তনের সহিত সম্পত্তির সূত্রপাত হইল—ভূমি সকলেরই প্রয়োজন হইল—ক্রমে তাহাতে কৃষকের স্বত্ব স্থাপিত হইল। যাহারা পরস্পর নিকট সম্পর্কীয়, তাহারা

একত্রে বসতি ও পরস্পর সহকারিতা করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক বৃহৎ দলে শত শত ক্ষুদ্র দল বা পরিবারের আবির্ভাব হইল। প্রত্যেক পরিবার প্রধানতঃ নিজ নিজ রক্ষা বিধানে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি হইল। উৎকৃষ্টতর কুটীর —ক্রমে সুন্দর গৃহ—নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বস্ত্র দ্বারা দেহাচ্ছাদন আরম্ভ হইল। গৃহস্থলীর দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হইল। এইরূপে সাংসারিক নানা অভাব প্রসূত হইল। এখন আর প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন ধারণোপযোগী সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না; শ্রম-বিভাজন প্রবর্ত্তিত হইল। পৃথক পৃথক কার্য্যে পৃথক পৃথক ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে লাগিল,—বিনিময়ের আবির্ভাব হইল। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে, প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্যাদির বিনিময় আরম্ভ হইল।

নেতা এখন আর স্বয়ং সমস্ত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না,—জীবিকা অর্জ্জনের পরিশ্রম একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইল। যুদ্ধ, বিচার, শান্তিরক্ষা, বিনিময়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্য্যেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহাও তিনি আর একাকী সম্যক্‌রূপে করিয়া উঠিতে পারিলেন না,—তাঁহাকে সহকারী নিযুক্ত করিতে

হইল। অপর লোকে তাঁহার ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিল এবং তাঁহার ও সহকারিগণের ব্যয় নির্ব্বাহ-জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি করস্বরূপ নিজ উৎপাদিত শস্যের কিয়দংশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। নেতা এক্ষণে রাজা হইলেন। (ইউরোপের স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারেও সমাজের পত্তন হইয়াছিল। এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রয়োজন।)

ক্রমে জ্ঞানচর্চ্চা, মনের বিকাশ ও নানাবিধ আবিষ্ক্রিয়া আরম্ভ হইল। জীবন ধারণের উৎকৃষ্ট-তর ব্যবস্থা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইল ও তাহার অভ্যন্তরে নানাবিধ কার্য্যের পৃথক পৃথক সম্পাদন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। বিনিময় ও ব্যবসায়স্রোত সবেগে প্রবাহিত, এবং "অভাব ও পূরণ" নিয়ম চারিদিকে ক্রিয়াবান হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যও গুরুতর হইয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নানাবিধ কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হইল। সভ্যতা ও জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। এক্ষণে সমাজের যে অবস্থা দেখিতেছ, এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমরা সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে একবার পরিশ্রমের ক্রিয়ার বিষয় ভাবিয়া দেখ।

ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক ক্রিয়া নাই, দেহাবরণ চর্ম্ম দ্বারাই জীবনের অধিকাংশ কার্য্য সাধিত হয়,—একটী পুরুভুজকে কর্ত্তিত করিলে প্রত্যেক অংশ পৃথক পুরুভুজে পরিণত হয়, প্রত্যেক অংশই জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত কার্য্য করে,—অতি প্রাচীনকালে, সমাজ-পত্তনের পূর্ব্বে, মানবজাতির অবস্থাও কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ ছিল। তখন প্রত্যেক মনুষ্যকেই জীবনধারণের উপযোগী প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। যেমন উন্নত প্রাণীতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পৃথক পৃথক ক্রিয়া—শ্রম-বিভাজন—দৃষ্টিগোচর হয়, —হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির ক্রিয়া পৃথক পৃথক সাধিত হয়, এবং সেই সমস্ত পৃথক পৃথক ক্রিয়া সমবেতে উন্নত প্রাণীর শরীর-যন্ত্র রক্ষিত ও চালিত হয়,—সেইরূপ মানবজাতির উন্নত অবস্থায় সামাজিক নানা পৃথক পৃথক ক্রিয়া—শ্রম-বিভাজন—চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ বাণিজ্যে, কেহ শস্যোৎপাদনে, কেহ চিকিৎসায়, কেহ শিক্ষাদানে, কেহ রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত;—সেই সমস্ত ক্রিয়াসমবেতে সমাজ-যন্ত্র রক্ষিত ও চালিত হইতেছে।

শ্রম-বিভাজন।—সমাজ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই

শ্রমবিভাজন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক নানা কার্য্যে অধিকতর পরিমাণে শ্রম-বিভাজিত হইতে পারে। শ্রম-বিভাজন, শ্রমের অপচয় নিবারণ ও তাহাকে সম্যকরূপে ফলোপধায়ী করিবার উপায়। যে দেশে যত অধিক পরিমাণে শ্রম-বিভাজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে দেশ সেই পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত পণ্ডিত আডাম স্মিথ, তাঁহার "ওয়েল্‌থ অফ্‌ নেসন্‌স্‌" (Wealth of Nations) নামক পুস্তকে আলপিন্‌ নির্ম্মাণের দৃষ্টান্ত দিয়া অতি সুন্দররূপে শ্রম-বিভাজনের উপকারিতা দর্শাইয়াছেন। আলপিন্‌ নির্ম্মাণ, অন্ততঃ অষ্টাদশ প্রকার পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়। যে পদার্থে আলপিন্‌ নির্ম্মিত হয়, প্রথমে একজন তদ্দারা তার প্রস্তুত করে,—একজন তাহা সোজা করে,—অন্য ব্যক্তি তাহা আলপিনের আয়তন মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তন করে,—অন্য ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করে,—দুই তিন ব্যক্তি আলপিনের মস্তক নির্ম্মিত ও সংযোজিত করে, একজন আলপিন পরিষ্কৃত করে, ইত্যাদি। এক্ষণে আলপিন নির্ম্মাণ কার্য্যের কোন কোন অংশ এক একটী পৃথক ব্যবসায়ে পরিণত

হইয়াছে। যদি এক ব্যক্তি একাকী ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, তবে সে সমস্ত দিনে ২০টী আলপিনের অধিক নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি দশ জন লোক ঐ সকল প্রক্রিয়া পৃথক পৃথক সম্পন্ন করে, তবে প্রতিদিন পঞ্চাশ সহস্র আলপিন্ প্রস্তুত হইতে পারে। শ্রম-বিভাজনের মহোপকারিতা প্রত্যেকে কারখানায় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আডাম স্মিথ শ্রম-বিভাজনের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—প্রথমতঃ; প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক পৃথক লোক ব্যাপৃত থাকিলে, তাহারা তৎপরতা ও কার্য্যকুশলতা লাভ করে, অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে এবং তাহাদের হস্তজাত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ; এক কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে যে সময় গত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে সে সময়ের অপচয় নিবারিত হয়। এতৎসম্বন্ধে ফসেট্ সাহেব বলেন, যে, এক কার্য্যে বহুক্ষণ ব্যাপৃত থাকিলে মনে এক প্রকার বৈরক্তি উপস্থিত হয় এবং সেরূপ অবস্থায় উত্তমরূপে কার্য্য করা যায় না, সুতরাং পরিশ্রম তত ফলোপধায়ী হয় না। মধ্যে মধ্যে কার্য্য

পরিবর্ত্তনে মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, এজন্য পরিশ্রম অধিক-তর ফলোপধায়ী হইবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়তঃ; পৃথক কার্য্যে পৃথক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ তাহা-তেই নিয়োজিত হয়, এবং ইহা দ্বারা নানাবিধ কল কৌশল উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং কল কৌশলের উদ্ভাবনে বহুল পরিমাণে সময়ের ও পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়।

আডাম স্মিথের মৃত্যুর পর ব্যাবেজ নামক অর্থ-নীতিবিৎ দর্শাইয়াছেন যে, শ্রম-বিভাজনের আর এক মহা উপকারিতা এই যে, যে কার্য্যে যে ব্যক্তির বিশেষ তৎপরতা ও কার্য্যকুশলতা আছে, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে; এবং ইহা দ্বারা সময়ের, পরিশ্রমের ও অর্থের অনেক অপচয় নিবারিত হইতে পারে। কারখানার অনেক কার্য্য বালক ও স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের মজুরী কম। শ্রম-বিভাজন দ্বারাই, যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, সেই কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

শ্রম-বিভাজন দ্বারা নূতন কল কৌশল যত আবি-ষ্কৃত হউক বা না হউক, কলের প্রবর্ত্তনে যে শ্রম-বিভাজনের প্রয়োজন হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। প্রত্যেক কলে কতকগুলি পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া সাধিত হয়; প্রত্যেক প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখা এবং তজ্জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কলের প্রবর্ত্তনে শ্রমের প্রভূত সাশ্রয় হইয়া থাকে। যে কার্য্যে সহস্র লোকের প্রয়োজন, কলের সাহায্যে তাহা অনায়াসে ১০।১৫ জন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

শ্রম-বিভাজন কিয়ৎ পরিমাণে "অভাব ও পূরণ" নিয়ম দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। যেখানে যে দ্রব্যের যত অভাব, সেখানে সে দ্রব্যের তত কাটতি হয়। যে পরিমাণে কাটতি হয়, সেই পরিমাণে উৎপাদন বা আমদানির চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা অধিক হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-বিভাজন আসিয়া পড়ে।

সমবেত-পরিশ্রম।—অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতেরা পরিশ্রমের ফলোপধায়িতা সম্বন্ধে, সমবেত-পরিশ্রমের উপকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন। এক কার্য্য সম্পাদন জন্য যখন দশ জন লোক একত্রে পরিশ্রম করে, তখন তাহাকে সমবেত-শ্রম বলা হয়। ওয়েকফীল্ড সাহেব প্রথমে সমবেত-শ্রমের উপকারিতার ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে সমবেত-শ্রম দুই প্রকার,—সহজ সমবেত-শ্রম ও মিশ্র

সমবেত-শ্রম। সহজ সমবেত-শ্রমের দৃষ্টান্তে তিনি বলিয়াছেন যে, যদি চারিটী শিকারী কুক্কুর পৃথক পৃথক ধাবিত হয়, তবে তাহারা যতগুলি শশক বধ করিতে পারে, দুইটী শিকারী কুক্কুর সমবেতে ধাবিত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক শশক বধ করিবে। বৃক্ষ ছেদন, ভারী দ্রব্য উত্তোলন, বৃহৎ নৌকা চালন, শস্য ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন, ইত্যাদি সহস্র বিষয়ে সহজ সমবেত-শ্রমের প্রয়োজন ও প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়।

মিশ্র সমবেত-শ্রমের দৃষ্টান্তে ওয়েকফীল্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, যখন কতকগুলি লোক, তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শস্যোৎপাদনে ব্যাপৃত হয় এবং আর কতকগুলি লোক নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত হয়, এবং পরিশেষে, পরস্পরে সেই অতিরিক্ত শস্য ও বস্ত্রের বিনিময় করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দারা তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মে অধিক পরিমাণে লোক নিযুক্ত করে, তখন ইহাকে মিশ্র সমবেত-শ্রম বলা যাইতে পারে। যে সকল কৃষক শস্য বিনিময় করিল, তাহাদিগকে হয়ত বীজ ক্রয় করিতে হইয়াছিল। যাহারা বীজ আনিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, যাহারা ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, জলসিঞ্চন, শস্যকর্ত্তন

ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সমবেত-শ্রম করিয়াছিল। আবার, যে সকল লোক অতি-রিক্ত বস্ত্র বিনিময় করিল, তাহাদের বয়ন কার্য্যের জন্য যাহারা সূত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, যাহারা কার্পাস আনিয়া সূত্রকরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছিল, যাহারা কার্পাস বীজ বপন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সমবেত-শ্রম করিয়াছিল।

যাহারা নীলের চাস করে, যাহারা নীলবড়ি প্রস্তুত করে, যাহারা নীলবড়ি ক্রয় করিয়া তন্তুবায়-দিগের হস্তে বিক্রয় করে, যাহারা তদ্দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করে, তাহারা সকলেই সমবেত-শ্রম করে। কিন্তু হয়ত, সেই কার্পাস ও নীলবড়ি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং বস্ত্রবয়ন, বস্ত্ররঞ্জন ইংলণ্ডে হইয়া-ছিল। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মিশ্র সমবেত-শ্রমে যদিও মহা উপকার সাধিত হয়, কিন্তু যত লোক সে শ্রমে ব্যাপৃত থাকে, তাহারা সহজ সমবেত-শ্রমের ন্যায়, পরস্পর একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। বস্তুতঃ, শ্রম-বিভাজন মিশ্র-সমবেত-শ্রম-নিয়মের অন্তর্ব্বর্ত্তী বা শাখা মাত্র।

শ্রম-বিভাজন ও সমবেত-শ্রমের প্রয়োগ।— এক্ষণে তুমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছ সন্দেহ নাই যে, পরিশ্রমের ফলোপধায়িতার পক্ষে শ্রম-বিভাজন ও

সমবেত-শ্রম অতীব প্রয়োজনীয়; এবং এই নিয়মদ্বয়ের ক্রিয়া ব্যতীত আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক জীবন অসম্ভব। তাহাদের ক্রিয়া যে দেশে যত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে, সে দেশ সেই পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইবে। যেখানে তাহাদের ক্রিয়া অল্প ও দুর্ব্বল, সেখানে পরিশ্রমের ফলোপধায়িতাও অতি ক্ষীণ। সে দেশ দারিদ্রপূর্ণ—উন্নতিবিহীন।

উক্ত নিয়মদ্বয় যে কেবল ব্যবসা বাণিজ্যে ও কারখানার কার্য্যে প্রয়োগ হইতে পারে এমন নহে, সংসারের অনেক কার্য্যেই তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে—গৃহস্থলীর ব্যাপারেও তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিবে, তাহাই অপেক্ষাকৃত সহজে হইবে ও অধিক পরিমাণে ফলোপধায়ী হইবে। সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের অপচয় নিবারণ জন্য শ্রম-বিভাজন ও সমবেত-শ্রম নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

অন্যান্য নিয়ম।—এক্ষণে আমরা পরিশ্রমের অপচয় নিবারণ সম্বন্ধে আর কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

১। **কার্য্য নির্ব্বাচন।**—মানসিক পরিশ্রম সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে, কার্য্য নির্ব্বাচনের উল্লেখ করা

হইয়াছে। শারীরিক শ্রম সম্বন্ধে, অধিক পরিমাণে না হউক, অন্ততঃ সমভাবে, তাহা প্রয়োজনীয়। কোন কোন প্রকার পরিশ্রমে ব্যক্তিবিশেষের মনের স্বাভাবিক গতি ধাবিত হওয়া কোন মতেই অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, নানা কারণে কার্য্য বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের, অন্যাপেক্ষা অধিকতর তৎপরতা ও দক্ষতা উৎপাদিত হয়। তাহা, অনেক পরিমাণে, মনের গতি, শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যেরূপ কার্য্যে যাহার তৎপরতা ও দক্ষতা আছে, তাহার পক্ষে সেইরূপ কার্য্যে পরিশ্রম করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবং এতদ্দ্বারাই পরিশ্রম সম্যকরূপে ফলোপধায়ী হইয়া থাকে। কারখানার কার্য্যে শ্রম-বিভাজন নিয়ম প্রয়োগে, বহুল পরিমাণে, উপযুক্ত কার্য্যে, উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে। যাহারা কারখানায় কার্য্য করে না, যাহাদিগকে একাকী পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে, কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন বিষয় নহে। অনেক সময়ে তাহা না করায়, শ্রমের বিস্তর অপচয় হইয়া থাকে। যে কার্য্যে যাহার দক্ষতা নাই, পার্য্যমানে সে কার্য্যে তাহার নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে।

২। দৈহিক শক্তি—শ্রমশীলতা।—পরিশ্রমের ফলোপধায়িতা অনেক পরিমাণে শারীরিক শক্তি ও শ্রমশীলতার উপর নির্ভর করে। যাহারা সবল ও দৃঢ়কায়, তাহারা দুর্ব্বল মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। কিন্তু শ্রমশীলতা ব্যতীত শারীরিক শক্তি বৃথা। যাহারা আলস্য-পরতন্ত্র, প্রভূত শারীরিক শক্তি সত্ত্বেও তাহাদের কৃত শ্রম কখন সম্যকরূপে ফলোপধায়ী হইতে পারে না। দুই চারি দিন গুরুতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইলেও কিছু হয় না। যাহারা নিরালস্য হইয়া, নিয়মিতরূপে ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাদের পরিশ্রমই সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ী ও উৎপাদনশীল হয়।

জল বায়ুর গুণাগুণ, অভ্যাস, বুদ্ধি, শিক্ষা, চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা, ইত্যাদি কারণে শ্রমজীবীদিগের শ্রমশক্তির ও শ্রমের ফলোপধায়িতার তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমবাসী শ্রমজীবিগণ কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গবাসী অপেক্ষা দৃঢ়কায় ও অধিক পরিশ্রমী; কিন্তু বাঙ্গালী শ্রমজীবী অধিকতর বুদ্ধিমান, চেষ্টা করিলে তাহার কৃত শ্রম অধিকতর ফলোপধায়ী হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিবে? পরিশ্রম বিনা সে বুদ্ধিতে কি ফল হইবে?

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালীর চক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অপকর্ম্ম। বঙ্গদেশে দারিদ্র্য নাই, একথা কে বলিতে পারে? চারিদিকেই তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মধ্যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী লোক কার্য্য করে,—তাহাদের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী? পয়েন্টস্‌ম্যান, সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান, চাপরাসী, চৌকিদার, মেট, কুলি, ইত্যাদি সকলেই পশ্চিম-দেশবাসী। কলিকাতার ভিতরে দেখ, পুলিসের কনষ্টেবল সমস্ত হিন্দুস্থানী। গুরুতর লজ্জার কথা! গবর্ণমেণ্ট ও বণিকদিগের কার্য্যালয়ে যত দ্বারবান ও চাপরাসী, তাহার অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। সৈনিকদলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। বঙ্গে কি দৃঢ়কায় মনুষ্য নাই? বঙ্গদেশে কি ভীরু ও কাপুরুষগণের আবাস-স্থান? সবলকায় মনুষ্যের অপ্রতুল নাই। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ ভীরু, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

কতকগুলি কারণ একত্র মিলিত হইয়া উল্লিখিত শোচনীয় দশা উৎপাদন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। আমরা, যতদূর অবগত হইয়াছি, বাঙ্গালী-চরিত্রে শ্রম-

শীলতা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতার অভাব, তাহার প্রবলতম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুলিসে ও পল্টনে যে সকল হিন্দুস্থানী সিপাহী কর্ম্ম করে, আমরা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে অনেকের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের পুত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। সেরূপ অবস্থাসম্পন্ন বাঙ্গালী গুরুতর শ্রমজনক কার্য্যে রত হওয়া দূরের কথা, গৃহের বাহির হওয়াও দুর্ভাগ্য মনে করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পরিশ্রম যে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের প্রসূতি, এ সংস্কার আমাদের মন হইতে অপনীত হইয়াছে। শারীরিক পরিশ্রম নীচতা ও ক্লেশময়—শারীরিক পরিশ্রম বর্জ্জন না করিলে কেহ ভদ্রলোক হইতে পারে না, এই বিষম অনিষ্টকারী সংস্কার জাতীয় মনে বদ্ধমূল হইতেছে। শারীরিক শ্রমজনক কার্য্যে পার্য্যমানে কেহই নিযুক্ত হইতে চাহে না—ভদ্রলোক হইবার উদ্দেশে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছে। অভাবপীড়িত না হইলে বঙ্গীয় শ্রমজীবী পরিশ্রমে রত হইতে চাহে না। আমরা কখন কখন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি যে, যতক্ষণ একদিনের আহার্য্য সামগ্রী গৃহে সঞ্চিত আছে, ততক্ষণ সে শ্রম জন্য গৃহের বাহির হয় না।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মনি প্রভৃতি সভ্য দেশে, কিছু লেখা পড়া শিখিলে, শ্রমজীবিগণ অধিকতর কার্য্যকুশল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গে তাহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে। যে কৃষকপুত্র বা অপর শ্রমজীবীর পুত্র, গ্রাম্য পাঠশালায় বোধোদয় পড়িল, অমনি সে চিরদিনের জন্য সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমে বিরত হইল—তাহার বেশ ভূষা পরিবর্ত্তিত হইল—সে ভদ্রলোক হইয়া উঠিল! শিক্ষা দ্বারা শ্রমজীবিগণের চরিত্রের সবলতা সাধিত না হইয়া, দুর্ব্বলতা উৎপাদিত হইতেছে। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি এরূপ শাত্রবভাব ভয়ানক অমঙ্গলের বিষয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। যতদিন তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমকে অস্পৃশ্য মনে করিবেন, ততদিন কখনই এ পতিত দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ দেশের উজ্জ্বল মণি জেনারেল ওয়াসিংটন, একদা অশ্বারোহণে কোন্ স্থানে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈনিক বিভাগের কতকগুলি মজুর একটী ভারী বস্তু উত্তোলন চেষ্টা করিতেছে, গুরুভার বশতঃ তুলিতে সমর্থ হইতেছে না। একজন সৈনিক

সেখানে দণ্ডায়মান আছে। ওয়াসিংটন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, মজুরদের সহিত যোগ দিয়া ঐ বস্তু উত্তোলন করিলেন। সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি মজুরদিগকে কেন সাহায্য কর নাই?” ওয়াসিংটনকে চিনিতে না পারিয়া সে গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল,—“আমি একজন করপোরাল্!” ওয়াসিংটন বলিলেন,—“করপোরাল্ মহাশয়! যখন এইরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার জেনারেল ওয়াসিংটনকে সংবাদ দিবেন।” সৈনিক ভয়ে, লজ্জায় অধোবদন হইল। যদি ওয়াসিংটনের এ গুণ না থাকিত, যদি তিনি শ্রমকাতর হইতেন, তবে কি তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিতেন?

সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ চিরদিনই মধ্য-শ্রেণীস্থ ভদ্রলোকদিগের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সদ্দৃষ্টান্তে, শ্রমজীবিগণের চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে। তাঁহাদিগকেও ওয়াসিংটনের ন্যায় সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। যদিও সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তিবলে সমাজভুল রক্ষিত হইবে—অভাব ও পূরণ নিয়মে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর হইবে—আলস্য-পরতন্ত্রগণ, আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, অদর্শন

হইবে—দুরবস্থাপীড়নে অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা উপস্থিত হইবে,—তথাপি শিক্ষিত লোকদিগের সদ্দৃষ্টান্তে ও সদুপদেশে অনেক অমঙ্গল নিবারিত, অনেক ক্লেশ বিদূরিত হইতে পারে। ইহাও সমাজের আভ্যন্তরিক শক্তির অন্তর্ভূত।

৩। বুদ্ধি।—পরিশ্রমের ফলোপধায়িতা অনেক পরিমাণে শ্রমজীবিগণের বিবেচনাশক্তির উপর নির্ভর করে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমেই কিয়ৎপরিমাণে মানসিক শ্রমও হইয়া থাকে। বিবেচনাশক্তি পরিচালনে, অনেক সময়, অপেক্ষাকৃত সহজে ও অল্প সময়ে কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। তুমি অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে যে, এক ব্যক্তি যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, অথবা বহু ক্লেশে সম্পন্ন করে, অন্য ব্যক্তি একটু বুদ্ধি চালনা করিয়া তাহা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে। এক খান গাড়ি কর্দ্দমময় স্থানে পড়িয়াছে,—সম্মুখস্থ উচ্চ ভূমির উপর দিয়া পথ। গাড়িবান ও বলীবর্দ্দ, প্রাণপণে শ্রম করিয়াও গাড়ি তুলিতে পারিতেছে না; আর এক ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইল, ২ বা ৩ শত পাদ ভূমি ঘুরাইয়া, অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর দিয়া, গাড়ি উঠাইয়া দিল। দুই জন

তবলদার একটী বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। যে দিকে বৃক্ষের ভার সে দিকে বৃক্ষ পতিত হইলে এক ব্যক্তির গৃহ চূর্ণ হইয়া যায়। দুইজনে বলপ্রয়োগে বৃক্ষকে অন্য দিকে পাতিত করিতে অসমর্থ। এক জন অপরকে বলিল,—"ভাই! যে দিকে বৃক্ষের ভার, সেই দিকস্থ কতকগুলি ডাল কাটিয়া ফেলা যাউক।" এই উপায়ে তাহারা ইচ্ছামত বৃক্ষ পাতিত করিল।

সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম বুদ্ধি প্রয়োগে অধিকতর ফলোপধায়ী হইতে পারে। বুদ্ধিমান শ্রমজীবীদিগকে নূতন কার্য্যে নিয়োজিত করিলে, তাহারা অচিরাৎ তাহা শিক্ষা করিতে পারে, এবং উপস্থিত কার্য্যে, আবশ্যক মত, শ্রমবিভাজন নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারে। বুদ্ধি দ্বারা অনেক সময়, শারীরিক বলের অভাব পূরণ হইয়া যায়, এবং অনুভব-শক্তি পরিচালন করিয়া অনেক কার্য্য সুগম উপায়ে সম্পন্ন করা যায়।

৪। বিশ্বাস।—শ্রমজীবিগণ যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়, তবে তাহাদের কৃত শ্রম অধিকতর ফলোপধায়ী হইবার সম্ভাবনা। বিশ্বাসী শ্রমজীবী-দিগকে কার্য্য অভাবে প্রায়ই বসিয়া থাকিতে হয় না,—তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সকলেই ইচ্ছা করে। অনেক সময়ে, নিয়োগকর্ত্তাকে তাহাদের

উপর নির্ভর করিতে হয়,—সে সময়ে তাহারা বিশ্বাসের সহিত কার্য্য না করিলে ক্ষতি অপরিহার্য্য। আবার দেখ, বিশ্বাসী শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পরিদর্শনের অধিক প্রয়োজন হয় না। পরিদর্শনের জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় হইত, তাহা বাঁচিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, চুরি, প্রতারণা ইত্যাদিতে যে প্রভূত অপচয় হয়, (যাহা পরিদর্শন দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যায় না) তাহাও নিবারিত হয়। পরস্পর বিশ্বাস বশতঃই লাভ উদ্দেশে সমবেত-পরিশ্রম সম্ভবপর হইয়া থাকে।

৫। চরিত্র।—শ্রমজীবিগণের চরিত্রের উপর অনেক পরিমাণে পরিশ্রমের ফলোপধায়িতা নির্ভর করে। যাহারা দুশ্চরিত্র ও মাদকাসক্ত, তাহারা কখনই যথোচিতরূপে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহারা প্রায়ই অলস ও প্রতারক হয়। জীবিকা অর্জ্জন জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় বটে; কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছার সহিত পরিশ্রম করে না,—সর্ব্বদাই সময় চুরি করিবার চেষ্টা করে। এরূপ শ্রমকারিগণের পরিশ্রম কখনই ফলোপধায়ী হয় না—অপচয় অনিবার্য্য।

৬। নিরাপত্তা।—সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, পরিশ্রম কখন ফলো-

পথায়ী হয় না। আজ যাহা গুরুতর পরিশ্রমে অর্জ্জন করিবে, কাল যদি তাহা অন্যলোকে অপহরণ করে, এরূপ অবস্থায় কেহই সঞ্চয় করিতে যত্নশীল হয় না; কেবল কোন প্রকারে জীবনধারণ করিবার উপযোগী শ্রম করিয়া থাকে। সুতরাং এমন অবস্থায় পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি অতি ক্ষীণ হইয়া থাকে। চুরি, ডাকাইতি, প্রতারণা, প্রবল দ্বারা দুর্ব্বলের পীড়ন, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের শোষণকারিতা, ইত্যাদি নানা হেতু বশতঃ শ্রমলব্ধ অর্থ অপহৃত হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে এ সকল উপদ্রব প্রায় নাই। দস্যু তস্করের আক্রমণ নিবারণে, প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলের রক্ষা সাধনে, রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্য পরিদর্শনে ও অত্যাচার নিবারণে, প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতি সাধনে, ন্যায় বিচার বিধানে, গবর্ণমেণ্ট সদা যত্নবান। ইহার ফল আমরা কি দেখিতেছি? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এদেশের অবস্থা যেরূপ ছিল এবং এক্ষণে যাহা দেখিতেছ, তাহার তুলনা না করিলে, তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। এ প্রস্তাবে সে তুলনা সম্ভবপর নহে। সে সময়ে দেশমধ্যে

শত শত ডাকাইতের দল, সাধারণের শ্রমলব্ধ ধন অপহরণ করিয়া, নিরাপদে বিচরণ করিত—প্রবল দুর্ব্বলের পীড়ন করিত—রাজকর্ম্মচারিগণ, দস্যু তস্করের ও প্রবল প্রতিবাসিগণের পরিত্যক্ত যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা শোষণ করিয়া লইত। সুতরাং পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এক্ষণে কি দেখিতেছ? জঙ্গলের পরিবর্ত্তে বসুমতী শস্যপূর্ণা হইয়াছে—নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের, কৃষিজীবিলোকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতেছে—কুটীরের স্থানে অট্টালিকা শোভিত হইতেছে—সমাজমধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অর্থের ব্যাপ্তি হইতেছে। সুতরাং পরিশ্রমের পক্ষে শুভদিন আসিয়াছে,—জাগরিত হও—উদ্যমের সহিত কার্য্য কর।

৭। অভাব ও পূরণ।—অভাব ও পূরণ স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন দেহ মধ্যে জলের প্রয়োজন হইলে, আমরা পিপাসা অনুভব করি এবং জল পান করিয়া সে অভাব পূর্ণ করি, সেইরূপ সমাজমধ্যে কোন বিষয়ের অভাব হইলে, তাহা পূরণের চেষ্টা হইয়া থাকে। যদি চাউলের অভাব হয়, তবে স্থানান্তর হইতে তাহার আমদানি হইয়া থাকে,

যদি কাষ্ঠের অভাব হয়, তবে তাহা পূরণের চেষ্টা হইয়া থাকে। বণিকগণ লাভ উদ্দেশে আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

কোন বিষয়ের অভাব পূরণ জন্য যে পরিশ্রম করা যায়, তাহাই সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ী হইবার সম্ভাবনা। যখন তোমাকে স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তখন তাহার ভাবী ফলাফলের দিকে দৃষ্টি করা আবশ্যক। তুমি যে বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার অভাব আছে কি না তাহা প্রথমে বিবেচ্য। যদি অভাব না থাকে, তবে তোমার পরিশ্রম বৃথা হইবার সম্ভাবনা। সত্য বটে, তুমি শ্রমজাত বস্তু দ্বারা সমাজ মধ্যে নূতন অভাব উৎপাদন করিতে পার এবং তোমার শ্রম সফল হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা ও দূরদর্শিতার কার্য্য। সমাজস্থ লোকের মানসিক প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে, শ্রমজাত বস্তু দ্বারা নূতন অভাব উৎপাদন করা সম্ভবপর নহে।

৮। উপাদান সংগ্রহ করিয়া পরিশ্রম।— যখন যে কোন পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবে, পূর্ব্বে তাহার

উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইবে। পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া, উপাদান সংগ্রহ জন্য পুনঃ পুনঃ তাহার গতি ভঙ্গ করা নিতান্ত অবৈধ। ইহাতে বিস্তর অপচয় হইয়া থাকে। একবার কার্য্যের গতি ভঙ্গ হইলে, পুনরায় তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। পুনঃ পুনঃ এরূপ করিতে হইলে, সময়ের প্রভূত অপচয় হইয়া থাকে।

৯। অপরাপর নিয়ম।—আমরা মানসিক অপচয় বিষয়ক প্রস্তাবে মনঃসংযোগ, অধ্যবসায়, স্থিরচিত্ততা প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, শারীরিক পরিশ্রম সম্বন্ধে সে সমস্তই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রয়োজ্য। এ প্রস্তাবে তাহার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজন। মানসিক শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত, শারীরিক পরিশ্রম কখন সম্যকরূপে ফলোপধায়ী হইতে পারে না। কখন আলস্য, কখন গুরুতর শ্রমে রত হইলেও বিশেষ ফল লাভ হয় না। নিরালস্য হইয়া নিয়মিতরূপে মানসিক, শারীরিক, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করা আবশ্যক। এইরূপ পরিশ্রমই উন্নতি লাভের উপায়।

উপসংহার।—এই প্রস্তাবের উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, পরিশ্রম করিতে কদাচ কুণ্ঠিত

বা কাতর হইবে না। ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, পরিশ্রম ব্যতীত সংসারে জীবন ধারণ অসম্ভব। পরিশ্রম মানবের নিয়তি—পরিশ্রম সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখের প্রসূতি। সংসারে সকলের অবস্থা সমান নয় এবং কাহারও অবস্থা চিরদিন একভাবে থাকে না। কখন সুখে আনন্দিত, কখন দুঃখে ব্যথিত,—ইহাই মানবের অবস্থা। তুমি যখন যে অবস্থায় স্থাপিত, পরিশ্রম সর্ব্বদা তোমার সহায়। অবস্থা অনুযায়ী পরিশ্রমে সর্ব্বদা রত থাকিবে—সামান্য জ্ঞানে কখন তাহাকে ঘৃণা করিবে না। জীবন ধারণ জন্য—কর্ত্তব্য পালন জন্য—যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, অতীব সামান্য হইলেও তাহা কাহারও অস্পৃশ্য হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ তাহাতেও মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দৃষ্টি করেন। সামান্য কর্ম্ম করা কখনই ঘৃণিত নহে, কিন্তু যে কর্ম্ম কর, তাহা কদর্য্যরূপে সম্পাদন করাই অত্যন্ত ঘৃণাজনক।

যখন যে কার্য্য করিবে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহা ন্যায়জ্ঞান সহায়ে, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত, উত্তমরূপে করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাই উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতা লাভের উপায়। যেমন ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতেও অনেক সময়ে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ

কার্য্য প্রসূত হইয়া থাকে। অর্দ্ধান্তঃকরণে বা অন্যায়রূপে যে কার্য্য করিবে, তাহাতে অনুদিন অধঃপতিত হইবে।

দুরবস্থাপীড়নে কখন পরিশ্রমে বিমুখ হইবে না। অনেক সময়, তাহা বন্ধুভাবে, শিক্ষকরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। পরিশ্রমই দুরবস্থা বিদূরিত করিয়া সৌভাগ্যের পথ পরিস্কৃত করিয়া দেয়। তুমি যতক্ষণ পরিশ্রম করিতে পার, ততক্ষণ গভীর দুরবস্থাতেও তোমার আশা আছে। আলস্যই সর্ব্বপ্রকার নিরাশার মূল। অতএব জীবনের প্রধান সহায় জ্ঞানে, সকল অবস্থাতেই পরিশ্রমকে আলিঙ্গন করিবে। নিয়মিত ন্যায়সঙ্গত পরিশ্রম—অধ্যবসায়—কখন বিফল হয় না—কখন প্রতারণা করে না। মধুমক্ষিকাগণের শ্রমশীলতা অতি প্রাচীন কালেই, কবিগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রাচীন হইলেও ইহা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মধুমক্ষিকাগণ যেমন প্রভূত পরিশ্রম সহকারে মধুচক্র গঠন করে ও দুর্দ্দিনের জন্য তাহার অভ্যন্তরে আয়াস-লব্ধ মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমাকেও বহু পরিশ্রমে সম্বল আহরণ করিয়া নিজ সৌভাগ্য-চক্র স্বয়ং গঠন করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়।

আর্থিক অপচয়।

বর্ত্তমান অবস্থা।—ভয়ানক দিন উপস্থিত! জীবন ধারণ দিন দিন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অভ্যুদয়ে চারিদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হইতেছে—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চালিত হইতেছে—বাণিজ্যস্রোত বহিতেছে,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে—উচ্চ আশা জাগরিত হইতেছে—জীবনের নূতন আদর্শ মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতেছে—অভাব বাড়িতেছে। আমরা ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ সহজে জীবন ধারণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহা অসম্ভব; কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের জীবনধারণোপযোগী নানা অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা পূরণ করা ব্যয়সাধ্য। যদিও সমাজ মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অর্থের ব্যাপ্তি হইতেছে—অর্জ্জনের নানা পথ ক্রমে উন্মুক্ত হইতেছে—কিন্তু তথাপি অভাব, দারিদ্র, চারিদিকে বিকটবেশে বিচরণ করিতেছে। লোক সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে—শিক্ষা প্রভাবে নানা জাতীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি

উপার্জ্জনের জন্য চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। কৃষি, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী, চাকরি,—তুমি যে দিকে যাও, শত শত স্বদেশীয় বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। এক দিকে অভাব—অন্য দিকে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা! জীবন ধারণ অতি গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহাতে সর্ব্বপ্রকার অপচয় নিবারণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবে।

কিন্তু, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আর্থিক,—অপচয়ের ভীষণ আকার দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঐ দেখ, অপচয় প্রবলভাবে আমাদের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান! আমরা কি তাহার বিনাশ সাধন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিব না?

দারিদ্র্য কেন?—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অর্থ উৎপাদন জন্য, ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন, এই ত্রিবিধ বস্তুর প্রয়োজন। এদেশে কি তাহার এতই অভাব যে এখানকার অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য-পীড়িত হইবে—উদরান্নের জন্য লালায়িত হইবে—সময়ে সময়ে অন্নাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে? ইহা কখনই বিধাতার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যদি আমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারি, অপচয় নিবারণ করিতে

পারি,—ঐশিক দানের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি,—তবে নিশ্চয়ই আমাদের দুরবস্থা চলিয়া যাইবে—আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব।

অর্থোৎপাদন-উপাদানের অপচয়।—এদেশে ভূমির অনাটন নাই—সহস্র সহস্র বিঘা পতিত বা জঙ্গলপূর্ণ ভূমি সঞ্চিত রহিয়াছে, যাহা এখনও কৃষকের হস্ত স্পর্শ করে নাই। এ দেশের উর্ব্বরতা চিরপ্রসিদ্ধ। চেষ্টা করিলে, নানাবিধ শস্য, নানাবিধ ফলমূল ও ব্যবসায়োপযোগী নানা সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে। চেষ্টা করিলে, লৌহ, কয়লা, প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ দ্রব্য লাভ করা যাইতে পারে। চারিদিকে নানা নদ নদী প্রবাহিত—অদূরে সমুদ্রকূল,—চেষ্টা করিলে, সে সকলের উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। এদেশে শ্রমজীবিলোকের অনাটন নাই। পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমজীবী। ইউরোপ অপেক্ষা এদেশে শ্রম অপেক্ষাকৃত সুলভ। এদেশে মূলধন * নাই, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না। ইউরোপ

* জীবন ধারণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, ও যাহা অর্থোৎপাদনকারী পরিশ্রমে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, তাহাকে মূলধন বলা যায়।

ও আমেরিকার ন্যায় প্রচুরতা এখানে নাই, কারণ অর্থোৎপাদক পরিশ্রমের ক্রিয়া অতি ক্ষীণ। কিন্তু অল্প হইলেও কিয়ৎপরিমাণে মূলধন যে ভারতেই সংগৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

তবে কিজন্য স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি দারিদ্র্যময়? কিজন্য চারিদিকে অভাবজনিত যাতনার আর্ত্তনাদ? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবে যে, অভাবের মূলে অপচয়। আমরা যদি অপচয় নিবারণ করিতে পারিতাম, অর্থ উৎপাদনের উপাদান সকল যথোচিতরূপে উৎপাদনকারী পরিশ্রমে নিয়োজিত করিতে পারিতাম, তবে অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশের ন্যায় এদেশও সৌভাগ্যশালী হইত সন্দেহ নাই। কোন স্থানে লোকসংখ্যার প্রবলতা বশতঃ, কৃষকগণ বহুক্লেশে উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে, কোন স্থানে উর্ব্বরা পতিত ভূমি জনশূন্য জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। স্বাভাবিক দানের অপচয় হইতেছে—তাহা উপভোগ করিবার চেষ্টা কাহারও নাই। খনিজদ্রব্য উদ্ধার করিয়া ধনশালী হইবার চেষ্টা কাহারও নাই,—সেই ধন ভূগর্ভে বৃথা নিহিত রহিয়াছে। সঞ্চিত ধন অনেক স্থানেই বৃথা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে যথোচিতরূপে পরিবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা—অর্থ উৎপাদনকারী পরিশ্রমে নিয়ো-

জিত করিবার চেষ্টা—অল্প স্থানেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেও অপচয়। সহস্র সহস্র শ্রমজীবী অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। অনেক স্থানে তাহারা উপযুক্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবার উপায় প্রাপ্ত হয় না। উৎপাদনকারী পরিশ্রমে নিযুক্ত করিতে পারিলে, তাহাদের দ্বারা কত অর্থ উৎপাদিত হইতে পারিত —তাহারা স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিত—নিয়োগকর্ত্তার গৃহ ধনপূর্ণ হইত—দেশের মঙ্গল হইত। তাহাদের শ্রমশক্তির অপচয় হইতেছে।

শ্রম-বিভাজন ও সমবেত-শ্রমের প্রয়োগ।—শারীরিক শ্রম বিষয়ক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রমবিভাজন ও সমবেত পরিশ্রম দ্বারা, পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং এই মহান্ উপকারী নিয়মদ্বয় অর্থাগমের প্রবল সহায়। সকল দেশেই নানা কার্য্যে এই নিয়মদ্বয়ের প্রয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা প্রয়োগের যেরূপ অভাব দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ বোধ হয় আর কুত্রাপি নহে। আমাদের জীবন ধারণোপযোগী দ্রব্যাদি, হয় প্রাচীন প্রথানুসারে এদেশে উৎপাদিত হয়, না হয় বিলাত হইতে আনীত হয়। কৃষক, কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায়, ইত্যাদি হিন্দু রাজত্বকালে যেরূপ নিয়মে কার্য্য করিত,

প্রায় সেইরূপ নিয়মে এখনও কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা অন্য প্রকার হইয়াছে। যদি তাহারা সময় ও অবস্থার অনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারে, তবে তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ক্রমে অদর্শন হইবে। বস্তুতঃ আমরা তাহাই দেখিতেছি। বিলাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া ক্রমে দেশীয় তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিকরগণ বিলুপ্ত হইতেছে।

যথোচিতরূপে শ্রমবিভাজন ও সমবেত-শ্রম দ্বারা এবং উৎকৃষ্ট গঠনযন্ত্র ব্যবহারে যে এদেশজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজে ও অধিকতর ফলোপধায়ীরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, বোধ হয় তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিবেন না। এবিষয়ে শিক্ষিত লোকদিগের অতি অল্পই যত্ন দেখা যায়। যাহারা সে সকল বস্তু প্রস্তুত করে, তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত দুঃখী লোক। নূতন কৌশল উদ্ভাবন ও নূতন প্রথা প্রবর্ত্তনে তাহাদের সাধ্য বা আস্থা নাই। সুতরাং ক্রমে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে।

কল ও কারখানা।—এদেশে এ যাবৎ অতি অল্প পরিমাণে কল ও কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কল দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়। যে কার্য্যে সহস্র লোকের প্রয়োজন, কলের সাহায্যে

তাহা অনায়াসে দশ জন লোক দ্বারা সাধিত হইতে পারে। এইরূপে যে পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়, তাহা অপরাপর কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইতে পারে। যে দেশে যে পরিমাণে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, সে দেশে সেই পরিমাণে কলের আধিক্য হইয়াছে। যে দেশে যে পরিমাণে কল চালিত হয়, সে দেশে সেই পরিমাণে অর্থসমাগম হয়। কারখানার কার্য্যেই, অধিক পরিমাণে শ্রম-বিভাজন ও সমবেতশ্রম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কলের ব্যবহার, শ্রম-বিভাজন ও সমবেত-শ্রম দ্বারা পরিশ্রমের সাশ্রয় হয়—উৎপাদনের ব্যয় কম হয়—এই জন্য কল ও কারখানাজাত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়। এই জন্যই এ দেশীয় কারিকরগণ, বিলাতী দ্রব্যের ন্যায় সস্তা দরে নিজ নিজ হস্তজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে অসমর্থ। এই জন্যই তাহারা বিলুপ্ত হইতেছে।

ভারতীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন নানা আদত (raw) সামগ্রী বিলাতে প্রেরিত হয়; সেখানে তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ এদেশে পুনঃপ্রেরিত হয়। যদি এখানে কল থাকিত, তবে সে সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে এই খানেই প্রস্তুত হইতে পারিত, আমদানি রপ্তানির ব্যয়

বাঁচিয়া যাইত। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইতাম। এদেশীয় সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কার্য্য প্রাপ্ত হইত—প্রভূত অপচয় নিবারিত হইত—অর্থের ব্যাপ্তি হইত—দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইত।

এদেশে উর্ব্বরা ভূমির অনাটন নাই—আদত (raw) দ্রব্যের অপ্রতুল নাই—শ্রমজীবী লোকের অভাব নাই—মূলধনও সংগৃহীত হইতে পারে। কল ও কারখানাজাত বিলাতি দ্রব্যের কাটতিও এদেশে যথেষ্ট আছে। ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, সুতা, দেসলাই প্রভৃতি অতি সামান্য এবং সর্ব্বদা প্রয়োজনের সামগ্রীও বিলাত হইতে আনীত। তবে কিজন্য এদেশে বহুল পরিমাণে কল ও কারখানা স্থাপিত হয় না? ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে না—জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানির পত্তন ও কার্য্য পরিচালন ব্যতীত তাহা অসম্ভব।

জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানি।—কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য, যখন অনেক লোকের মধ্যে চাঁদা দ্বারা মূলধন সংগৃহীত হয়, এবং তদ্দ্বারা ব্যবসায়ের কার্য্য পরিচালিত হয়; তখন তাহাকে জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানি বলা হয়। যাঁহারা চাঁদা দেন তাঁহারা অংশীদার। তাঁহারা সকলে ঐ কার্য্য-

পরিচালন করিতে অসমর্থ, এজন্য তাঁহারা আপনাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে, কার্য্য পরিচালনার্থ প্রতিনিধি মনোনীত করেন। তাঁহাদিগকে ডাইরেক্টর বলা হয়। এইরূপ কার্য্যে চাঁদা দিবার জন্য কিছু সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজন। যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম এদেশে আপামর সাধারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন—যে ভাগ্যবান্ বণিক সম্প্রদায়, প্রবল সাহস ও অধ্যবসায় বলে, আপনাদের বিপণি মধ্যে ভারতীয় রাজসিংহাসন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন —তাহাও, এইরূপে চাঁদা দ্বারা মূলধন সংগৃহীত হইয়া, স্থাপিত হইয়াছিল।

এইরূপ কোম্পানির পত্তন তত কঠিন বিষয় নহে, কিন্তু তাহার কার্য্য পরিচালন অতি গুরুতর বিষয়। যথোচিতরূপে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানির কার্য্যপরিচালন জন্য, একতা, সাহস, দূরদর্শিতা, মিতব্যয়িতা, সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, পরস্পর বিশ্বাস প্রভৃতি কতকগুলি সদ্গুণের প্রয়োজন। তাহদের অভাবে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

এদেশীয় শিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবকগণ, অংশ বিক্রয় নিয়মে, মূলধন সংগ্রহ করিয়া, কি জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়েণ্টষ্টক কোম্পানির পত্তন চেষ্টা না করেন, বলিতে পারি না। শিক্ষা ব্যাপ্তি প্রভাবে শিক্ষিত

লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখন সমস্ত শিক্ষিত যুবকদিগের পক্ষে চাকরী লাভ অসম্ভব। তাঁহাদের সংখ্যা যত অধিক, তত পদ কোথা পাওয়া যাইবে? ডাক্তারী, ওকালতী, প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা কয়জন যুবক প্রতিপালিত হইতে পারে? ঐ সকল ব্যবসায়ে এত লোক প্রবিষ্ট হইয়াছেন যে, নূতন লোকের পক্ষে সহসা তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন।

বাণিজ্য।—চাকরীর নিমিত্ত তুমি কি জন্য লালায়িত হইবে? কিজন্য সামান্য বেতনে অবিরত পরিশ্রম করিয়া শীর্ণকায় হইবে?—ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিবে? চাকরী অর্থ উপার্জ্জনের বা শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রশস্ত পথ নহে। যদি তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্ব থাকে, যদি শিক্ষা দ্বারা তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা সাধিত হইয়া থাকে, তবে তুমি নিশ্চয়ই স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনে সৌভাগ্যশালী হইবার চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-ক্ষেত্র ঐ তোমার সম্মুখে পতিত। সেই দিকে ধাবিত হও—শরীর, মনের সমস্ত শক্তি সেই দিকে চালিত কর—সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত পরিশ্রম কর—আশাতীত ফল লাভ করিবে।

অধ্যবসায় বলে, কৃষ্ণপান্তি, মতিলাল শীল ও রাম দুলাল সরকার বাণিজ্যদ্বারা অগাধ সম্পত্তির অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বিনা সম্বলে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চেষ্ট; পদার্থবিহীন মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রমশীলতায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন অদর্শন হইয়াছিল—সৌভাগ্য স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়াছিল। বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে রামগোপাল ঘোষের নাম কখন বিলুপ্ত হইবে না। তিনিও সম্বলবিহীন হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমে কোন বণিকের কার্য্যালয়ে সামান্য বেতনে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশ্রম, দক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভাবে অনতিবিলম্বে ঐ কার্য্যালয়ের অংশিদার ও পরিশেষে, কলিকাতার বণিকদলে গণনীয় ও সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, চেষ্টা করিলে এখনও অনেকে সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন। যাহা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তাহা তোমার পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে না।

ভারতবাসিগণের মধ্যে পারসী ও মাড়ওয়াড়িগণ ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া

ছেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহা অনুভব করিবার জন্য দূরে যাইবার আবশ্যক নাই, একটু মনোযোগের সহিত কলিকাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী বণিকের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়, কিন্তু কলিকাতা বিদেশীয় বণিকে পরিপূর্ণ! বাঙ্গালী যেরূপ বুদ্ধিমান সেই পরিমাণে শ্রমসহিষ্ণু ও বাণিজ্যকুশল হইলে বঙ্গের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না—শিক্ষিত যুবকগণের ভবিষ্যতের জন্য কাহাকেও ব্যাকুল হইতে হইত না। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার অবশ্যই প্রবল কারণ আছে সন্দেহ নাই। তাহা আর কিছুই নহে, বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হইবার জন্য, যে সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তাহা এখনও জাতীয় চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত হয় নাই।

প্রথমতঃ; শ্রমকাতরতা আমাদের মর্জ্জাগত ব্যাধি, কিন্তু শ্রমশীলতা বাণিজ্যের জীবন স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ; আমরা মাড়ওয়াড়িগণের ন্যায় মিতব্যয়ী জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারি না। অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। মিতব্যয়িতা ব্যতীত কখন বাণিজ্যে উন্নতি লাভ

হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভাংশ একত্রিত হইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আমাদের চরিত্রে সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অভাব লক্ষিত হয়। যে কোন কার্য্যেই হউক, আমাদের উদ্যম শারদীয় মেঘের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এ সকল গুণ না থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ অসম্ভব।

সঞ্চিত ধন।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অর্থ উৎপাদনের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্যও সঞ্চিত ধনের প্রয়োজন। কেবল উপার্জ্জন চেষ্টা করিলেই তোমার কার্য্য শেষ হইল না। যাহাতে অর্জ্জিত ধনের অপচয় নিবারণ করিতে পার, তাহাকে রক্ষা করিতে পার, এবং ফলোপধায়ী কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পার, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। অল্প বা অধিক পরিমাণে উপার্জ্জন সকলেই করিতে পারে, কিন্তু অর্জ্জিত ধন কয় ব্যক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? উপার্জ্জন অপেক্ষা অর্জ্জিত ধন রক্ষা করা অধিকতর বিবেচনাশক্তি ও দূরদর্শিতার কার্য্য। সুতরাং ইহা শিক্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ক শিক্ষার অভাবে নানা ক্লেশ ও যাতনা উপস্থিত হয়—জীবন মধুরতাশূন্য হয়। যে সকল উপায়ে

আমরা অপচয় নিবারণ করিতে পারি, সঞ্চয়শীল হইতে পারি, তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমরা এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে দুই একটী বিষয়ের আলোচনা করিব।

ব্যয়।—তুমি নানা কার্য্যে প্রতিদিন ব্যয় করিতেছ। অপচয় নিবারণ জন্য সেই দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাক, তাহার মধ্যে এরূপ অনেক ব্যয় আছে যাহা না করিলেও চলিতে পারে, এবং এরূপ কতকগুলি ব্যয় আছে যাহা সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। অবস্থা বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিবারণ করিবে। ক্ষুদ্রজ্ঞানে কোন প্রকার ব্যয়ের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিবে না। একটী সূচীর ন্যায় ক্ষুদ্রধারে অবিরামে জল নিঃসারিত হইয়া, কিছুদিনে একটী জলাশয় শূন্য হইতে পারে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়ে কিছুদিনে লক্ষাধিপের ভাণ্ডার শূন্য হইতে পারে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়েই অধিকাংশ অপচয় সংঘটিত হইয়া থাকে; কারণ সেরূপ ব্যয় অবিরামে হইতেছে, এবং সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে না।

ব্যয়কালে কখন কর্ত্তব্য-জ্ঞান-পরিশূন্য হইবে না। যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাতে কদাচ ব্যয় করিবে

না। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিবারণ করিতে না পারিলে, অনেক সময় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে না। অপব্যয় নিবারণ করিতে না পারিলে, কর্ত্তব্য পালনে যথোচিত ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে না?

এ সম্বন্ধে একটী গুরুতর নিয়ম এই যে সর্ব্বদা অবস্থানুযায়ী অবস্থান করিবে, এবং আয় অপেক্ষা কদাচ অধিক ব্যয় করিবে না। যদি এই নিয়ম পালন করিতে পার, তবে অনাটনের ভীষণ যাতনা কখন উপস্থিত হইবে না—দুশ্চিন্তায় জীবনী শক্তি ক্ষয় হইবে না—সর্ব্বদা আনন্দমনে, কর্ত্তব্য পালন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

ঋণ।—কখন কখন এরূপ সময় উপস্থিত হয় যখন সঞ্চিত ধন নাই, অথচ ব্যয়ের উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। ব্যয়ের সুযোগ সর্ব্বদাই পাওয়া যায় এবং ইহা অতি সহজ ও আশু তৃপ্তিকর কার্য্য। ব্যয়ের পরামর্শদাতা জগতে অসংখ্য, কিন্তু সঞ্চয়ের পরামর্শদাতা অতি অল্পই দেখিবে। এরূপ সুযোগে অনেকে ঋণ করিয়া ব্যয় করেন। ইহাই সর্ব্বনাশের হেতু! একবার ঋণজালে জড়িত হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ বড় কঠিন হইয়া উঠে। সংসারে অধিকাংশ লোকেরই ব্যয় অপেক্ষা আয়

অধিক নহে। অনেক লোকেই কষ্টে স্বষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ঋণ কি ভয়ানক! ঋণের প্রকৃতি বর্দ্ধনশীল। কেবল যে তাহা অবি-রামে সুদ প্রসব করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য প্রভূত অপচয় হয় এরূপ নহে, সর্ব্বপ্রকার মন্দ কর্ম্মের ন্যায় ঋণের ফল অতি দূরব্যাপী। সর্ব্বদা ঋণ-জড়িত থাকিলে মনের অবস্থা বিকৃত হয় এবং ক্রমে চরিত্রের সাধুত্বাও অদর্শন হইয়া পড়ে। একটী ঋণ কোন প্রকারে উপস্থিত হইলে তাহা অপর ঋণ আকর্ষণ করে—তাহার সহচর অনুচর স্বরূপ একটী একটী করিয়া অন্য ঋণ উপস্থিত হয়। ঋণ গ্রহণ অভ্যস্ত হইলে গৃহীতার সাবধানতা, মিতব্যয়িতা ও স্বাধীন-চিত্ততা অদর্শন হয়—অনাটন বশতঃ সংসারের চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা ও অপচয় হইতে আরম্ভ হয়।

যে গৃহে একবার ঋণ প্রবেশ করে, প্রায়ই সে গৃহের শান্তি ও উন্নতি অস্তমিত হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, সর্ব্বদা বিমর্ষ মনে, দুশ্চিন্তা-পীড়িত হইয়া দিন যাপন করিতে হয়,—তাঁহার পক্ষে যথোচিত-রূপে কর্ত্তব্যপালন করা অসম্ভব হইয়া উঠে—দুশ্চিন্তা ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানসিক ও শারীরিক শোভা ক্ষয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ নাশ ও উন্নতির গতি

রোধ করে। ঋণপীড়িত হইয়া তুমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, কখন তাঁহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ঋণ অপেক্ষা অধিকতর বিপদ সংসারে আর কিছুই নাই। অনেক সময়ে ম্যান সম্ভ্রম রক্ষা জন্য—বাহ্যিক দৃশ্য রক্ষা জন্য—লোকে ঋণ করিয়া থাকে। ভ্রান্ত মানব! তুমি ঋণ করিয়াই বস্তুতঃ ম্যান সম্ভ্রম নাশের সূত্রপাত করিলে। অবস্থা অনুযায়ী অবস্থানই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক,—ইহাতে যাহারা তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহারা অদূরদর্শী—অন্ধ। অঋণী না হইলে তুমি সংসারে কখন নিরাপদ, সুখী ও উন্নত হইতে পার না—ন্যায় ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে পার না। অতএব পার্য্যমানে কখন ঋণ করিও না।

দ্রব্য-সামগ্রী।—অপচয় নিবারণ উদ্দেশে সাংসারিক দ্রব্য সামগ্রীর দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার গৃহে অনবধানতা বশতঃ, সর্ব্বদা নানা দ্রব্যের অপচয় হইতেছে। এইরূপে তোমার ক্লেশার্জ্জিত অর্থের কত অংশ বৃথা নষ্ট হইতেছে। সে সমস্তই প্রয়োজনীয় বস্তু এবং কোন ক্রমেই অনায়াস-লব্ধ নহে। আজ যাহা বৃথা নষ্ট হইল কাল তাহা

কষ্টে আহরণ করিতে হইবে—তাহার অভাবে অসুবিধা ও সময় নাশ হইবে। ক্ষুদ্র জ্ঞানে কোন বস্তুর অপচয় নিবারণে শিথিল-যত্ন হইবে না। ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা অনেক সময়ে গুরুতর প্রয়োজন সাধিত হয়। "যাহাকে রাখ সেই রাখে," এই সামান্য বাক্যের গভীর অর্থ আছে। একদা, একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্র দ্বারা, ছিদ্র রোধ করিয়া, এক খানি জলমগ্নোন্মুখ নৌকা রক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। আবার, ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর অপচয়ে কিছুদিনে গুরুতর অপচয় সংঘটিত হয়।

সঞ্চয়শীলতা।—সঞ্চয় উদ্দেশে সঞ্চয়শীলতা শিক্ষা করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কিছু সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত উৎপাদনশীল পরিশ্রমে কিছুই নিযুক্ত করা যাইতে পারে না। আবার, কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ, কোন্ প্রয়োজন, কোন্ অভাব উপস্থিত হয়, অনেক সময়ে তাহার ভাবিদৃষ্টি অসম্ভব। সঞ্চিত অর্থ বিনা অনেক সময়ে তাহাদের সমাধান ক্লেশকর। কেবল ইহাই নহে। যিনি সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী, তিনিই সংসারে প্রকৃতরূপে কর্ত্তব্য-পালনে সমর্থ হন। যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, সামান্য অবস্থা সম্পন্ন হইলেও তিনিই যথার্থ সুভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ

মনুষ্য। যিনি সঞ্চয়শীল, তাঁহাকে অভাব ও ঋণ জনিত যাতনা ও তাহার দূরগামী বিষময় ফল ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং সঞ্চয় দ্বারা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সর্ব্বপ্রকার অপচয় বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

যদি তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা থাকে, তবে সঞ্চয় নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে।

প্রথমতঃ ;-সঞ্চয় উদ্দেশে মিতব্যয়িতা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি অপচয় নিবারণ করিতে না পার, যদি অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান কর, তবে কখন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ ; যখন তুমি সংসারে প্রবেশ করিবে, সেই সময় হইতে নিয়মিতরূপে, তোমার আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ সঞ্চিত রাখিবে। তোমার আয় যতই অল্প হউক, তুমি তাহার এক ক্ষুদ্র অংশ অনায়াসেই রক্ষা করিতে পার। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আয়ের $\frac{১}{৩২}$ অংশ নিয়মিতরূপে রক্ষা করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই ক্লেশকর হইতে পারে না।

তুমি মনে করিতে পার, এত ক্ষুদ্রাংশ রক্ষা করিয়া কি হইবে? ক্ষুদ্রের শক্তি অসীম। পরমাণু

কি ক্ষুদ্র পদার্থ তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। বিশাল-দেহ হিমালয় পর্ব্বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু সংযোগে উৎপাদিত হইয়াছে। গিরিদেহনিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিলিত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিত হয়। ক্ষুদ্রের শক্তি অনুভব করিতে না পারাতেই সংসারের অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি প্রবল ঝটিকাবেগ দেখিয়াছ, রেলওয়ে এঞ্জিনের প্রবল শক্তি দেখিয়াছ। সে শক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে যে অদৃশ্যপ্রায় শক্তি নিহিত আছে, তাহাই অবস্থা বিশেষে, পরস্পর মিলিত হইয়া ঐরূপ প্রবল শক্তি উৎপাদন করে। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাংশ (পয়সা) মিলিত হইয়াই সহস্র বা লক্ষ মুদ্রা একত্রিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে ৫৲ টাকা জমা করে, এবং তাহার সুদ শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে পাওয়া যায়, এবং প্রতিবৎসর সুদ মূল মিলিত হইয়া তাহার উপর ঐ হিসাবে সুদ চলে, তবে একজন লোকের জীবিত কালেই এক লক্ষ টাকা জমা হইতে পারে। অল্পের শক্তি এত অধিক। অতএব যতই অল্প হউক, যদি নিয়মিতরূপে সঞ্চয় করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই কিছুদিনে তোমার অবস্থানুযায়ী একটী মূলধন সঞ্চিত হইবে।

সঞ্চিত ধন, অর্থ উৎপাদনকারী পরিশ্রমে—কোন লাভজনক ব্যবসায়ে—নিয়োজিত করা তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিবার উপায়। গবর্ণমেণ্টের সুনিয়মে সর্ব্বত্রেই সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। আয়ের সঞ্চিত অংশ নিরাপদে ঐ ব্যাঙ্কে রাখা যাইতে পারে এবং ব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে কিছু সুদ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যেরূপে যাঁহার সুবিধা হয়, সঞ্চিত ধনকে সর্ব্বদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কৃপণতা।—আমরা কৃপণতার পোষকতা করিতেছি না। অপব্যয়ের ন্যায় কৃপণতাও মহা পাপ। সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ জন্য, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য পালন জন্যই অর্থের প্রয়োজন। কৃপণের ধন দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, কারণ সে ধনের উপর তাহার কোন শক্তি নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মিতব্যয়িতা কৃপণতা নহে। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবস্থোচিত ব্যয় না করাকে কৃপণতা কহে। অনুচিত কার্য্যে ব্যয় না করা এবং উচিত কার্য্যে যথোচিত ব্যয় করাকে মিতব্যয়িতা কহে। মিতব্যয়ী না হইলে, কেহই প্রকৃতরূপে দানশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। সঞ্চিত অর্থ না থাকিলে কে উপযুক্ত সময়ে দান করিতে সমর্থ হয়?—অপরাপর

কর্ত্তব্য কার্য্যে উপস্থিত মত ব্যয় করিতে সমর্থ হয় ?

উপসংহার।—আমরা এযাবৎ অর্থ উপার্জ্জন ও অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে-ছিলাম। অর্থ উপার্জ্জন ও অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি-লেই তোমার কার্য্য শেষ হইল না। অর্থের গুরুতর দায়িত্ব আছে। যতই অর্থাগম অধিক হইবে, তোমার কর্ত্তব্যভার ততই গুরুতর হইবে। তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন সাধন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তুমি তাহা সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয় করিতে বাধ্য।

অর্থ উপার্জ্জন মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে; তাহা জীবন ধারণের, জীবন কার্য্য সমাধানের একটী উপায় মাত্র। সুতরাং যখনই আমরা সমস্ত শরীর মন কেবল মাত্র অর্থার্জ্জনে নিয়োজিত করি, তখনই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি, তখনই সুখ অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রভূত ধনশালী ব্যক্তিগণের জীবন দ্বারা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, কেবল ধন দ্বারা মানব মন সুখী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। বিধাতার নিয়োজিত পথে বিচরণ ব্যতীত, শরীর মনের সম্যক্ বিকাশ ও কর্ত্তব্যপালন ব্যতীত যথার্থ সুখ ও উন্নতি অসম্ভব। উদ্যমের সহিত

সংসারে বিচরণ কর, জ্ঞানোপার্জ্জন কর, অর্থো-পার্জ্জন কর, পরমেশ্বর দত্ত দান সকল উপভোগ কর, কিন্তু এক দণ্ডের জন্য জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না।

"মানবের মন ! ধাও বেগে অবিরাম
মিলিতে অনন্ত মনে—নিয়তি তোমার ;
সৃষ্ট স্রষ্টা মিশামিশি রহস্য অপার !"

সমাপ্ত।